SUPERIOR SUNY

সুমন্ত আসলাম

মহাকিঞ্চন

BOILOVERS.COM

ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারের তিন নম্বর গলিতে ঢুকতেই এক দোকানদার বলল, 'স্যার, নতুন আলু আছে। শোল মাছ দিয়ে রান্না করলে দুই পেট ভাত বেশি খেতে পারবেন।'

দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। থমকে দাঁড়ালেন। মাথা উঁচু করে দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বড় বড় করে ফেললেন চোখ দুটো, 'তাহলে তো সমস্যা, নাকি!'

'কীসের সমস্যা স্যার?'

'সমস্যা অনেকগুলো। এক. ভাত বেশি খেলে চাল বেশি খরচ হবে। দুই. ভাত খুব ভালো খাবার না, এটা বেশি খেলে শরীরে অনেক রোগ জন্ম নেবে। তিন. ভাত বেশি খাওয়া মানে ঘুম, এতে কাজের ক্ষতি হবে।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী হাসতে হাসতে বললেন, 'যে জিনিস নিলে তিনটা ক্ষতি হবে, সেটা কি নেওয়া ঠিক হবে, নাকি?

প্রচ্ছদ :: আনিসুজ্জামান সোহেল

সুমন্ত আসলাম

মহাকিঞ্চন

কাকলী প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলি প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আনিসুজ্জামান সোহেল

বর্ণ বিন্যাস
আলিফ-মীম কম্পিউটার্স
বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম : ১২৫ টাকা

Mohakippon, by Sumanto Aslam
Published by A. K. Nasir Ahmed Salim
Kakoli Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100.
Price : 125.00 Tk.

ISBN : 984-70133-0494-0

আমার এক ফুপা আছেন, তিনি এত কৃপণ যে, তার বড় ছেলের বিয়েতে দইয়ের ব্যবস্থা ছিল, বিয়ে শেষে দুই পাত্র দুই বেঁচে ছিল, সেই দুই পাত্র দই তিনি ফুটপাতে রেখে বিক্রি করেছিলেন! সিরাজগঞ্জ শহরের ধনী লোকদের অন্যতম তিনি। তার কৃপণতার আরো গল্প আছে।

প্রিয় ফুপা, প্রিয় ... খান

[সবাইকে ফুপার নামটা জানিয়ে লজ্জা দিতে চাই না তাকে। তিনি আমার ফুপা, তিনি লজ্জা পেলে আমিও তো লজ্জা পাব, নাকি!]

প্রতিটি মানুষ তার নিজের মতো করে থাকতে চায়। আপনি আপনার মতো করে থাকতে চেয়েছেন, থাকছেন। এতে দোষের কিছু নেই। কৃপণতা করে আপনি তো আর অন্যের ক্ষতি করছেন না!

'কঞ্জুস' নামে মজার একটা উপন্যাস লিখেছিলাম ২০০৪ সালে। তারপর থেকেই কৃপণতা নিয়ে আরো একটা উপন্যাস লেখার পোকা কুটকুট করছিল মাথায়। নতুক আঙ্গিকে, নতুন ভাবনায়, নতুন নতুন মজা নিয়ে।

মহাকিপ্পন — এবার সেটা লিখে ফেললাম। ভালো-মন্দ, সব বিচারের ভার আপনাদের ওপর।

— সুমন্ত আসলাম

মাখরাজ মুৎসুদ্দীর খুব ইচ্ছে করছে সামনে বসা ছেলেটার গালে একটা চড় মারতে। একটা না, দুটো। দু'গালে দুটো। এলেবেলে ধরনের কোনো চড় হবে না, ঠাস ঠাস করে চড়। হাতের তালু সম্পূর্ণ মেলে চড়গুলো এমনভাবে মারতে হবে, যাতে হাতের কিছু অংশ গালে, কিছু অংশ কানে লাগে। এতে একসঙ্গে দুটো কাজ হবে—গাল দুটোও লাল করে দেওয়া যাবে, কান দুটোরও তালা লাগিয়ে দেওয়া যাবে। কান তালা লাগার পর সে কিছু শুনতে পাবে না কিছুক্ষণ। তখন ইচ্ছেমতো তাকে গালি দেওয়া যাবে, জগতের যত কুৎসিত গালি আছে মনের সাধ মিটিয়ে তা বলা যাবে।

ছেলেটার দিকে ভালো করে তাকালেন তিনি। না, চড় মারা যাবে না তাকে। কারণ, দুটো। প্রথম কারণ—এ এলাকার সবচেয়ে খারাপ লোকের ছেলে সে। দ্বিতীয় কারণ—চড় মারার সঙ্গে সঙ্গে যদি ছেলেটাও উল্টো চড় মারে! তাহলে একেবারে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে, মান-সম্মান ধুলোয় গড়াগড়ি খাওয়া তো দূরের কথা, ড্রেনের ময়লা পানিতে মাখামাখি হয়ে মিশে যাবে একেবারে। তাছাড়া ছেলেটার যা স্বাস্থ্য, তার এক চড়ে একসঙ্গে তিনটি কাণ্ড ঘটে যাবে—গাল লাল হবে, কানে তালা লাগবে, মুখের দু-একটা দাঁতও পড়ে যাবে!

পায়ের ওপর পা তুলে সোফা সেটে বসে ছিল ছেলেটা এতক্ষণ। মাখরাজ মুৎসুদ্দীর চাহনি দেখে পা'টা নামিয়ে বসল সে। ছেলেটা যা বলেছে, তা বেশ কিছুক্ষণ আগে বলেছে। সেটা শুনে তিনি একেবারে চুপ হয়ে গেছেন। কোনো জবাব দেননি তার। এতক্ষণ পর কথাটা আবার কীভাবে শুরু করা যায়, ভেবে পাচ্ছেন না তিনি তা।

চোখ দুটো হঠাৎ সামান্য বড় করে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। সোফা সেটের মাথার কাছে বড় একটা তেলাপোকা দেখা যাচ্ছে। রাতে ঘরে তেলাপোকা মারার ওষুধ ছিটানো হয়েছিল, সেটার কারণে তেলাপোকাটা বেশ কালো হয়ে গেছে, হাঁটছেও ক্লান্ত ভঙ্গিতে। তেলাপোকাটা হঠাৎ উড়ে গিয়ে ছেলেটার ঘাড়ে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে হাউকাউ করে সোফা থেকে

লাফ দিয়ে উঠল ছেলেটা। পায়ের একটা স্যান্ডেল ছিটকে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর সামনে গিয়ে পড়ল, আরেকটা পায়েই সে দৌড়ে গেল দরজার কাছে। এই দৌড়ে যাওয়ার সময় সোফার টেবিল থেকে কাচের একটা ফুলদানি ভেঙে ফেলল সে। মেঝেতে টুকরো টুকরো পড়ে রয়েছে এখন সেটা। ঘাড় থেকে ততক্ষণে তেলাপোকাটাও ঠাঁই নিয়েছে মেঝের ওই টুকরোগুলোর পাশে। অকস্মাৎ ছিটকে পড়াতে থমকে আছে সে মেঝেতে।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই মাখরাজ মুৎসুদ্দীর কাছে হাস্যকর মনে হলো। এত বড় একটা দেহ, সে কিনা একটা তেলাপোকা নিয়ে কী কাণ্ডটাই না করল। সঙ্গে সঙ্গে মুৎসুদ্দী সাহেব বুঝে ফেললেন—জিনিস মোটাতাজা হলেও সাহস বেশি না, খুবই কম!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই একটু নড়েচড়ে বসলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ছেলেটার সাহস কম হওয়াতে তিনি নিজে একটু সাহসী অনুভব করলেন। সোফার হাতার ওপর একটা হাত তুলে কাত হয়ে বসলেন তিনি একটু। পা দুটো সোফার ওপর তুলতে নিয়েই থেমে গেলেন। ভালো দেখাবে না এটা। আরো একটু কাত হয়ে খুক করে কেশে তিনি বললেন, 'একটু আগে যে কথাটি তুমি আমাকে বললে, তা কি তোমার বাবা জানেন?'

চেহারাটা শরমিন্দা হয়ে গেল ছেলেটার, 'না।'

'তোমার বাবাকে তো জানানো দরকার, নাকি?'

'আপনি রাজি হলেই বাবাকে জানাব আমি।'

'আমি রাজি হলে তো হবে না, আমার মেয়েরও রাজি হতে হবে, নাকি?' মাখরাজ মুৎসুদ্দী সোজা হয়ে বসলেন, 'তুমি বরং তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাও। তার সঙ্গে আলাপ করে দেখি।'

'বাবাকে পাঠানো ঠিক হবে না।' মাথা নিচু করে ফেলল ছেলেটি।

'কেন!'

'একটা অসুবিধা আছে।'

'কীসের অসুবিধা?'

'বলতে শরম লাগছে।'

'শরম লাগলেও বলো।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী ঝুঁকে বসলেন ছেলেটার দিকে, 'জিনিসটা তো আমাকে জানতে হবে, নাকি?'

কেমন যেন মোচড়ামুচড়ি করতে লাগল ছেলেটা। তাই দেখে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'তোমার নাম তো মাহবুব, নাকি?'

মুচড়িয়েই ছেলেটা বলল, 'জি।'

'তুমি যেভাবে মোচড়ামুচড়ি করছ, তোমার কি বাথরুম পেয়েছে মাহবুব?' বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

ঝট করে সোজা হয়ে বসল মাহবুব, 'না না, বাথরুম পায় নাই। আসলে— ।' মাথার পেছনটা এমনি এমনি চুলকাতে চুলকাতে মাহবুব বলল, 'বাবাকে পাঠানো খুব রিস্কি। বছর তিনেক আগে বড় ভাইয়ের বিয়ের পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন বাবা। দেখা শেষে বাবারই পছন্দ হয়ে যায় মেয়েকে। তিনি এখন আমার তিন নম্বর মা। ভয় পাচ্ছি, আবার পাত্রী দেখতে গিয়ে যদি বাবা— ।' কথা শেষ করে না মাহবুব। মাথা নিচু করে ফেলে সে আবার।

মাখরাজ মুৎসুদ্দী গভীর চোখে মাহবুবের দিকে তাকালেন। ছেলেটার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম নাকি! তিনি আরো ভালো করে তাকিয়ে ছেলেটাকে বললেন, 'তুমি এখন বাসায় যাও। পরে একসময় কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

পায়ের ওপর আবার পা তুলতে নিয়েই থেমে গেল মাহবুব। চেহারা বিনয়ী করে বলল, 'কথাটা ভেবে দেখবেন আংকেল। আমি ছেলে কিন্তু খারাপ না। বিয়ের আগেই আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি আমার বাবার মতো তিনটা বিয়ে করব না। যখন-তখন বউদের গায়ে হাত তুলব না।' মাহবুব হঠাৎ সোফা থেকে উঠে এসে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনার মেয়েকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আমি কিন্তু ছেলে হিসেবে খারাপ না। চার মাস পাবনার মানসিক হাসপাতালে ছিলাম, তখনো কিন্তু কোনো খারাপ কিছু করি নাই আমি।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দির মনে হলো—না, এবার একটা চড় মারা যায়। কান-গাল মিলিয়ে ঠাটিয়ে একটা চড়। দাঁত একটা না, চার-পাঁচটা ফেলে দিতে হবে একসঙ্গে। প্রয়োজন হলে সবগুলো ফেলে দিয়ে ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে নতুন করে দাঁত লাগাতে হবে। মনে মনে কুৎসিত একটা গালি দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, খুবই কুৎসিত গালি।

মাহবুবের পিঠে হাত রাখলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। আস্তে আস্তে ঘাড়ের কাছাকাছি নিয়ে স্থির করলেন হাতটা। ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ছেলেটাকে ঘর থেকে বের করে দিতে। তিনি তা করলেন না, সংবরণ করলেন নিজেকে। ঘাড়ের কাছাকাছি হাত দিয়েই তিনি ছেলেটাকে দরজার কাছে নিয়ে এলেন। চেহারাটা হাসি করে ফেললেন তিনি, 'আজকের মতো তাহলে আসো, পরে একসময় কথা হবে। নাকি?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মাহবুব। মাখরাজ মুৎসুদ্দীর ডান হাতটা ওর দু'হাতের মাঝে চেপে ধরে বলল, 'আমি খুব আশাবাদী আংকেল। আমি

যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে না পারি, তাহলে আমাকে আবার পাবনার ওই হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। হাসপাতালে দুজন ডাক্তারের মাথা ফাটিয়েছিলাম আমি, এবার যদি যাই পাঁচজনের মাথা পাঠাব। মাথা ফাটানোর জন্য কিছু করতে হয় না। ভাত খাওয়ার জন্য স্টিলের যে থালাটা দেয়, ওটা হাতে নিয়ে, কাত করে, থালার কোনাটা মাথা বরাবর মারলেই একেবারে কেল্লাফতে। মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকবে একটু পর, লাল টকটকা রক্ত।'

চোখ দুটো আবার বড় করে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। এর মাথা তো দেখা যাচ্ছে আগের মতোই আছে। আউলা মাথা, ঠিক হয়নি কোনো কিছুই। বরং আউলা বোধহয় আরো বেশি হয়েছে।

মাখরাজ মুৎসুদ্দীর চোখ দুটোকে আরো বড় করে দিয়ে মাহবুব বলল, 'আংকেল, আমি কিন্তু গান জানি। একটা গান শুনবেন?'

অবাক হওয়ার ভান করলেন মুৎসুদ্দী সাহেব, 'গান জানো তুমি! কয়টা গান জানো?'

'অনেকগুলো।' মাহবুব কিছুটা লাফ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কিন্তু নাচও জানি আংকেল। দাঁড়ান— ।' পিঠ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে সোজা হলো মাহবুব, 'আপনাকে গানও শোনাই, নাচও দেখাই।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী ছেলেটাকে জাপটে ধরার মতো জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবা রে, অন্য একদিন তোমার গানও শুনব, নাচও দেখব। আজ তুমি যাও, তোমার বাবা বোধহয় তোমার জন্য চিন্তা করছেন, নাকি!'

'আজ শুনবেন না!' প্রচণ্ড অসন্তুষ্টি মাহবুবের গলায়। পরক্ষণেই চোখ দুটো উজ্জ্বল করে ফেলল সে। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা কুকুর হেঁটে যাচ্ছে। মাখরাজ মুৎসুদ্দীর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, 'দাঁড়ান, সাহস কত কুত্তাটার! সালাম না দিয়া আমাদের সামনে দিয়া হেঁটে যায়! পাছায় একটা লাথি দিয়া আসি।'

কুকুরটা আস্তে আস্তে দৌড়ে যাচ্ছে। পা টিপে টিপে কুকুরটার পেছনে যাওয়ার চেষ্টা করছে মাহবুব। কিন্তু সে কাছে যাওয়ার আগেই টের পেল কুকুরটা। চমকে উঠে, একটু থেমে, ঝেড়ে দৌড়াতে লাগল সে, পেছনে পেছনে মাহবুব। লম্বা রাস্তা, কুকুরটা দৌড়াচ্ছে, মাহবুবও। যেন কুকুরটাকে লাথি না মারা পর্যন্ত তার মুক্তি নাই।

দরজা বন্ধ করে বাসার ভেতর চলে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। সঙ্গে সঙ্গে ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'আপনি এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বললেন! ও তো একটা পাগল। পরশু দিন চৌধুরী মার্কেট থেকে আমি আর দিনা

হেঁটে আসছিলাম। বড় রাস্তার ওই কোনা থেকে আমাদের দেখেই পিছু নেয় ও। আমি তো ওকে চিনি। জুব্বার খলিফার ছোট ছেলে। চার-পাঁচ মাস পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ছিল।'

'পিছু নিয়েছিল কেন?'

'দিনাকে বিয়ে করতে চায় ও। আমার পাশ দিয়ে আসতে আসতে বলছিল, আন্টি, আমি বিয়ে করব। আমি বললাম, কাকে? দিনার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে, ওকে। দিনা তো শুনে আগুন। পায়ের স্যান্ডেল খুলে পেটাতে চাচ্ছিল ওই পাগলটাকে।' বাজারের ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'বাজারে যাও। অনেক কিছু আনতে হবে।'

'লিস্ট করে দাও। মনে থাকবে না এত কিছু। আরো একটা ব্যাগ দাও তো। বড় একটা বোয়াল মাছ কিনব আজ। সঙ্গে কচি লাউ।'

দুটো ব্যাগ নিয়ে বাসার বাইরে এসেই চমকে উঠলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তার বাসার উল্টো পাশের রাস্তায় কোনায় যে খালি প্লটটা আছে, তার সামনে একটা ট্রাক দাঁড়ানো। ট্রাক থেকে লোহার রড নামানো হচ্ছে শব্দ করে। এ এলাকায় তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী খায়ের পাটোয়ারী তার খালি প্লটে বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। একতলা, দোতলা, তিনতলা করে সে ছয়-সাততলা করে ফেলবে, আর তিনি কি না তার প্লটে টিনশেড করে রেখেছেন। বৃষ্টির দিনে রান্নাঘর দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ে; ড্রইংরুমের ভেন্টিলেটর ভাঙা, দুপুরে সেখান দিয়ে ঝকঝকে রোদ ঢুকে থমকে থাকে সোফা সেটে; বাইরের দেওয়ালে ফাংগাস ধরে সবুজ হয়ে গেছে। তার এই টিনের চালের বাড়ির সামনে খায়ের পাটোয়ারী তরতর করে বিল্ডিং তুলে ফেলবে — এটা সহ্য করার মতো না।

বুকের বাঁ পাশে তিরতির করে ব্যথা শুরু হলো হঠাৎ। মাখরাজ মুৎসুদ্দী সেখানে হাত চাপা দিয়ে বাসায় ফিরে এলেন আবার। ফেরদৌসী বেগম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, 'আপনি এখনই তো বাজারে গেলেন। বাজার না করেই ফিরে এলেন যে!'

বুকে হাত দিয়েই মাখরাজ মুৎসুদ্দী কাতর গলায় বললেন, 'বাসায় সরিষার তেল আছে না?'

'আছে।' ফেরদৌসী বেগম কিছুটা দৌড়ে এসে স্বামীকে ধরে বললেন, 'আপনার বুক ব্যথা করছে নাকি?'

'হ।'

'হঠাৎ বুক ব্যথা কেন?'

কিছু বলতে নিয়েই থেমে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তার বুকের ভেতর শব্দ হচ্ছে; তার চেয়েও বেশি শব্দ হচ্ছে বাইরে, ট্রাক থেকে খায়ের পাটোয়ারীর প্লটে রড ফেলার শব্দ। মাথাটাও ঘুরে উঠল হঠাৎ। ফেরদৌসী বেগম স্বামীকে ছেড়ে বললেন, 'দাঁড়ান, রান্নাঘর থেকে তেল নিয়ে আসি। বুকে মালিশ করে দেই আপনার।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দীর কী যেন ঘটে গেল হঠাৎ। মাথার ভেতর চক্কর দিয়ে দিয়ে উঠল আরো জোরে। নতুন একটা ভাবনা খেলে গেল মগজে। রান্নাঘরে যেতে নেওয়া স্ত্রীর একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ, তেল আনতে নাকি?'

'হ্যাঁ, আপনার বুকে ব্যথা না! মালিশ করতে হবে তো!'

'বুকে ব্যথা কমে গেছে। মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। মাথায় পানি ঢালো।'

ফেরদৌসী বেগম দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে পানি আনলেন এক বালতি। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, মাথার নিচে একটা পলিথিন দিয়ে, পানি ঢালতে লাগলেন মাথায়। মুখটা আস্তে আস্তে হাসি হাসি হয়ে উঠল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। সেই হাসি হাসি মুখ নিয়ে তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফেরদৌসী বেগম, বলো তো তেলের দাম বেশি না পানির দাম?'

'পানির আবার দাম আছে নাকি! তেলের দাম।'

'কারেক্ট।' পাশ থেকে তোয়ালেটা নিয়ে, মাথায় চেপে, ঝট করে বিছানায় উঠে বসলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। গদগদ হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গুড গার্ল। সহিহ করে সত্য কথাটা বলেছ তুমি, নাকি!'

'হঠাৎ করে পানি আর তেলের দামের কথা বললেন কেন আপনি?' খুব আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ফেরদৌসী বেগম।

দুষ্টু প্রেমিকের মতো ফেরদৌসী বেগমের দু'গাল দু'হাত দিয়ে টিপে দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তারপর চোখ দুটো একটু সরু করে বললেন, 'ও তুমি বুঝবে না বেগম। বোঝার দরকারও নেই তোমার। দাও, বাজারের ব্যাগ দাও। বাজারটা সেরে আসি, নাকি!'

পাশের টেবিলে রাখা ব্যাগ দুটো নিয়ে ফেরদৌসী বেগম মাখরাজ মুৎসুদ্দীর হাতে দিলেন। সেখান থেকে একটা ব্যাগ স্ত্রীর হাতে ফেরত দিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। ফেরদৌসী বেগম ভ্রূ কুঁচকিয়ে বললেন, 'আপনি না দুটো ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন!'

'তাই নাকি!' ফেরদৌসী বেগমের হাতে দেওয়া ব্যাগটা আবার ফেরত নিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তারপর দু'হাতে ব্যাগ দুটো নিয়ে মেলে ধরলেন সামনে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন ব্যাগটা বড়, বলো তো?'

'আপনার ডান হাতেরটা।'

সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন স্ত্রীর দিকে। ফেরদৌসী বেগম কপাল কুঁচকে ফেললেন এবার, 'আবার ফেরত দিচ্ছেন কেন?'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী গলাটা করুণ করে বললেন, 'তুমি কি চাও আমি এখনই মারা যাই?'

'আলাই-বালাই, এটা কী বলছেন আপনি!'

'বড়টা রেখে তাহলে ছোটটা নিয়েই বাজারে যাই। বুক ব্যথা, মাথা ব্যথা — বাজারের বড় ব্যাগ টানতে টানতে যদি মারা যাই, নাকি!'

ছলছল করে উঠল ফেরদৌসী বেগমের চোখ। স্বামীর একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'থাক, আজ বাজারে যাওয়ার কাজ নেই।'

স্ত্রীর মাথায় একটা হাতে রেখে মহাপুরুষের মতো মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'তোমার মুখে বাজারে না যাওয়ার কথাটা শুনে বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু আজ না গেলে কাল তো যেতেই হবে। পানি খেয়ে কিংবা একেবারে না খেয়ে তো আর থাকা যাবে না!' বাম হাতে রাখা ছোট ব্যাগটা ডান হাতে নিয়ে বের হয়ে গেলেন তিনি বাসা থেকে। কিন্তু খায়ের পাটোয়ারী প্লটের দিকে তাকিয়েই সমস্ত শরীরটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল তার। রড তো আছেই, পাশের আরেকটা ট্রাক থেকে ইটও নামানো হচ্ছে সারি সারি। চোখ দুটো বুজে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কান্না আসছে তার। কান্নার পানির সঙ্গে শরীর থেকে লবণ বের হয়ে যাবে — এটা ভাবতেই মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল তার। চোখ দুটো আরো চেপে ধরলেন তিনি। না, কান্না করা যাবে না, অন্তত আপাতত না।

ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারের তিন নম্বর গলিতে ঢুকতেই এক দোকানদার বলল, 'স্যার, নতুন আলু আছে। শোল মাছ দিয়ে রান্না করলে দুই প্লেট ভাত বেশি খেতে পারবেন।'

দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। থমকে দাঁড়ালেন। মাথা উঁচু করে দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বড় বড় করে ফেললেন চোখ দুটো, 'তাহলে তো সমস্যা, নাকি!'

'কীসের সমস্যা, স্যার?'

'সমস্যা অনেকগুলো। এক. ভাত বেশি খেলে চাল বেশি খরচ হবে। দুই. ভাত খুব ভালো খাবার না, এটা বেশি খেলে শরীরে অনেক রোগ জন্ম নেবে। তিন. ভাত বেশি খাওয়া মানে ঘুম, এতে কাজের ক্ষতি হবে।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী হাসতে হাসতে বললেন, 'যে জিনিস নিলে তিনটা ক্ষতি হবে, সেটা কি নেওয়া ঠিক হবে, নাকি?'

হাতের আলুটা ঝুড়িতে রেখে দিল দোকানদার। মাখরাজ মুৎসুদ্দীর কথার কোনো জবাব দিল না সে। তিনি আগের মতোই হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার কাছে এমন আলু আছে নাকি যেটা দিয়ে তরকারি রান্না করলে ভাত কম খাওয়া হবে?'

চেহারা কঠিন করে দোকানদার বলল, 'জি স্যার, আছে।'

'আছে!' সমস্ত মুখ জ্বলজ্বল করে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'দাম কত?' গলার স্বরটা সরু করে ফেললেন, 'কত করে কেজি?'

'দাম লাগবে না স্যার।'

'দাম লাগবে না মানে!'

'স্যার, এগুলো পচা আলু। প্রতিদিন অনেকগুলো পচে যায়। এমনিতেই ফেলে দিতে হয় এসব।' দোকানদারও চেহারা বিস্তৃত করে ফেলেছে, 'এ আলু দিয়ে তরকারি রান্না করলে ভাত খাওয়া তো দূরের কথা, ভাত মুখেই দিতে পারবে না।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে মশকরা করছ, নাকি!' চেহারাটা রাগী রাগী করে ফেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।'

'আপনি কি আমার দুলাভাই, না শালা যে মশকরা করব আপনার সঙ্গে? আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমি তার উত্তর দিয়েছি। স্যার— ।' দোকানদার পা দুটো গুটিয়ে বলল, 'আমি যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর না দিতাম, তাহলে সেটা বেয়াদবি হয়ে যেত না! আপনি মুরব্বি মানুষ, আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করা কি ঠিক! ওই মন্তাজ— ।' দোকানদার দোকানের পাশে থাকা টোকাই মতো ছেলেটার দিকে তাকায়, 'দোকানে তো মাছি জইম্যা যাইতাছে, হাতের কাপড়টা দিয়া বাড়ি-বুড়ি দে।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী আর দাঁড়ালেন না। বাজারের কোনায় বড় একটা দোকান আছে। তিনি সাধারণত সেখান থেকে বাজার-সদাই করেন। এগিয়ে গেলেন তিনি সেদিকে।

বড় দোকানের দোকানদার বেলাল মাখরাজ মুৎসুদ্দীকে দেখেই সালাম দিল লম্বা করে। লুঙ্গিটা টেনে-টুনে বসল। তারপর গোপন কথা বলার মতো ফিসফিসিয়ে উঠল সে, 'স্যার, ঘটনা তো ঘটে গেছে!'

মাখরাজ মুৎসুদ্দীও গলার স্বর নিচু করে ফেললেন। বেলালের দিকে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, 'কীসের ঘটনা বেলাল?'

হাত দিয়ে বাম দিকে ইশারা করল বেলাল, 'ওই যে কোনার দোকানদারটা আছিল না, হ্যারে তো ম্যাজিস্ট্রেট স্যার ধইর‍্যা নিয়া গেছে।'

'কেন!'

'ও তো মাপে কম দিত।' দু'পাশে মাথাটা ঘুরিয়ে, সতর্কতা অবলম্বন করে বলল, 'বেশ কয়েক দিন ধরেই এই আকামটা করে আসছিল। আজ ম্যাজিস্ট্রেট স্যার ভ্রাম্যমাণ আদালত নিয়া আসছিল। সবার বাটখারা পরীক্ষা করতে করতে শেষে দেখে, ওরটা এক শ' গ্রাম কম। কেউ এক কেজি জিনিস নিলে সেখানে এক শ' গ্রাম কম দিত ও।'

'তাই নাকি!' মন খারাপ করার বদলে চেহারাটা উজ্জ্বল করে ফেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

'ঘটনাটা শুনে আপনি খুশি হলেন মনে হয় স্যার!'

'ঠিক খুশি না।' সামনে ছোট একটা কাঠের টুলে বসা বেলালের একটা হাত ছুঁয়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে আমার। কথাগুলো তোমার আর আমার মাঝেই থাকবে। বলা যায়, তোমার আর আমার মাঝে গোপন একটা চুক্তি হবে।'

চমকে ওঠার ভঙ্গি করে বেলাল, 'গোপন চুক্তি!'

'হ্যাঁ, গোপন চুক্তি।' যতটুকু নিচু স্বরে বলা যায়, মাখরাজ মুৎসুদ্দী সেভাবে বললেন, 'এটা কোনো লিখিতভাবে হবে না, মৌখিকভাবে হবে, তবে গোপন থাকবে ব্যাপারটা। দুনিয়ার কেউ জানবে না, কেউ না। কেবল তুমি আর আমি।'

টুলের ওপর পা তুলতে নিয়ে আবার নিচু করে ফেলে বেলাল। লুঙ্গিটা আবার গুছিয়ে নেয় সে, 'চুক্তিটা কি এখানে হবে, না— ।' হাত বাড়িয়ে বাজারের সামনের দিকটা দেখায় বেলাল, 'ওই চায়ের দোকানের সামনে হবে? ওখানে তো এখন মানুষজন কম।'

'দোকান ছেড়ে ওখানে গেলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না?'

'অসুবিধা আর কী! কয়েক টাকা কম বেচা হইব।'

'তাহলে আর দেরি করার দরকার নেই, তাড়াতাড়ি আসো। চুক্তিটা সেরে ফেলি।' হন হন করে সেদিকে এগিয়ে যান মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

লুঙ্গিটা কোমরের সঙ্গে টাইট করে বাঁধতে বাঁধতে পেছনে পেছনে এগিয়ে আসে বেলালও। চায়ের দোকানের সামনে এসে বলল, 'চা খাবেন তো স্যার?'

'চা— ।' কী একটা ভেবে মুখটা সামান্য হাসি হাসি করে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'খাওয়াবে যখন, খাওয়াও।'

'দুধ চা তো?'

'খাই, দুধ চা-ই খাই।'

'চিনি কম খাবেন, না বেশি?'

'দাম তো একই, তাহলে বেশিই দিতে বলো, নাকি!'

চায়ের দোকানদারের দিকে তাকাল বেলাল, 'আক্কাস, দু'কাপ চা দে। চিনি বেশি।'

'দুধও একটু বেশি দিতে বলো।'

'দুধও একুট বেশি দিস।'

চা বানানো হলে দু'হাতে দু'কাপ নিয়ে একটু সরে এলো বেলাল। ডান হাতের কাপটা মাখরাজ মুৎসুদ্দীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ঝটপট বলে ফেলেন স্যার। এখন বেচা-কেনার টাইম তো। খরিদ্দাররা বিরক্ত হবে।'

চায়ে চুমক দিয়ে বেলালের আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তোমার কাছে কি ওই দোকানদারের মতো এক শ' গ্রাম কমের বাটখারা আছে?'

বেলাল বুঝতে পারেনি কথাটা। চায়ে চুমক দিতে নিয়েই থেমে গেল সে তাই, 'কথাটা বুঝলাম না স্যার!'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী আরো কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন বেলালের, 'মাপে কম দেওয়ার ওরকম কোনো বাটখারা আছে নাকি তোমার?'

'ছি ছি, মাপে কম দেব কেন আমি! আমি তো চোর না। চোররাই তো— ।' শব্দ বেশি হয়ে যাচ্ছিল, বেলালের মুখের দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দী থামিয়ে দিলেন তাকে, 'আস্তে বেলাল!' আশপাশ তাকিয়ে বেলালের একটা হাত চেপে ধরে চায়ের দোকান থেকে আরো একটু ফাঁকে আনলেন তাকে, 'মাপে কম দিতে বলি নাই তোমাকে। আমাদের মধ্যে যে গোপন চুক্তিটা হবে, সেটা হলো— ধরো, তোমার কাছে এক কেজি গোল আলু চাইলাম আমি। তুমি আমাকে এক শ' গ্রাম কম দেবে, দেবে নয় শ' গ্রাম।'

বেলাল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'এক শ' গ্রাম কম দেব কেন আমি?'

কিছুটা বিরক্ত হন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তোমাকে না আস্তে কথা বলতে বললাম বেলাল! তুমি আগেই কোনো কথা বলবে না। আমি কথা শেষ করি। তারপর তুমি কথা শুরু করবে, নাকি!' চায়ে আবার চুমক দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তোমার কাছে আমি যে জিনিসই এক কেজি চাই না কেন, তুমি দিবে নয় শ' গ্রাম। এবং তুমি ওই নয় শ' গ্রামেরই দাম নেবে। এই যে তুমি এক কেজির জায়গায় নয় শ' গ্রাম দেবে, এটা জানব কেবল আমি আর তুমি। আরে কেউ না।'

'এতে আপনার লাভ?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে বেলাল।

'এই লাভের ব্যাপার আপাতত তোমার না জানলেও চলবে, নাকি!'

'ঠিক আছে স্যার।' চায়ে শেষ চুমক দিয়ে বেলাল বলল, 'তাতে তো নয় শ' গ্রামের বাটখারার প্রয়োজন নাই। এক কেজির বাটখারা দিয়ে মাপার সময় ওপাশে সদাইয়ের সঙ্গে এক শ' গ্রামের বাটখারাটা দিলেই চলব।'

'তোমার কাছ থেকে তো আমি প্রায় সব জিনিসই নেই, হরেক রকমের জিনিস নেই। এভাবে এত কিছু মাপার সময় হঠাৎ করে কেউ না দেখে ফেলে!' উদ্বিগ্ন দেখায় মাখরাজ মুৎসুদ্দীর চেহারা।

'না, কেউ দেখব না।'

'না দেখলেই ভালো।' মাখরাজ মুৎসুদ্দীও কাপে শেষ চুমক দেন, 'তুমি আমাকে নয় শ' গ্রাম জিনিস দেবে, দামও দেব নয় শ' গ্রামের। এতে কোনো অসুবিধা নেই তো তোমার?'

'আমার আর অসুবিধা কী?'

'তাহলে চুক্তিটা হয়ে গেল, নাকি!'

বেলালের চোখে-মুখে অপ্রস্তুত ভাব, 'জি।'

'তাহলে শেষ কথা হলো—আমি তোমার দোকানে গিয়ে বলব, 'বেলাল, এক কেজি মসুরের ডাল দাও, তুমি দেবে— ।'

ক্লাসে স্যারের প্রশ্নের উত্তর পারার মতো বেলাল ঝট করে বলল, 'আমি দেব নয় শ' গ্রাম।'

'গুড।' দু'হাতের তালু পরস্পর ঘষে বেশ তৃপ্তি নিয়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'আমি তোমাকে বলব, বেলাল এক কেজি বেগুন দাও— ।'

'আমি দেব নয় শ' গ্রাম।' দু'কান পর্যন্ত হাসি বিস্তৃত করে ফেলে বেলাল, 'এভাবে আলু, তেল, মরিচ, চিনি, চাল, আটা, সুজি, গুড়, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মুড়ি, চিড়া— ।' ঝরঝর করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে বেলাল, 'লবণ, বিস্কুট, লতা, মিষ্টি কুমড়া— ।' টান দিয়ে দম নেয় বেলাল, 'যা-ই এক কেজি চান না কেন, আমি দেব নয় শ' গ্রাম, দামও নেব নয় শ' গ্রামের।'

'একদম ঠিক।'

খুব জরুরি একটা কথা মনে পড়েছে, এ রকম ভঙ্গিতে চোখ দুটো বড় করে বেলাল হঠাৎ বলল, 'যে জিনিস আধা কেজি চাইবেন?'

'সেটা দিবে চার শ' পঞ্চাশ গ্রাম, নাকি!'

'আড়াই শ' গ্রাম চাইলে?'

'দুই শ' গ্রাম।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সম্ভবত এক শ' পঁচাত্তর গ্রাম তো দিতে পারবে না তুমি!'

'একটু ঝামেলা হবে, দাম ধরতেও মুশকিল হবে।'

'ওকে, আড়াই শ' গ্রাম চাইলে দুই শ' গ্রামই দিও।'

'জি।'

বেলালের সামনের দিকে ডান হাতের তালু মেলে ধরলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তাহলে হাতে হাত মিলিয়ে চুক্তিটা হয়ে যাক। দেখো, এই গোপন চুক্তিটা যেন উইকিলিসও জানতে না পারে!'

'ওইটা আবার কে?'

'থাক, ওটা না জানলেও তোমার চলবে।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী বেলালের তালুটা চেপে ধরে বললেন, 'এই চুক্তি উপলক্ষে আরেকটা চা হবে নাকি?'

'আরেক কাপ খাবেন?'

'তুমি যদি খাওয়াও আমি তো আর না করতে পারি না।' মাখরাজ মুৎসুদ্দীর হাসিটাও দু'কান পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে এখন।

ব্যাগ বোঝাই বাজার করে বাসায় আসতেই ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'আজ তো অনেক ধরনের শাক এনেছেন দেখছি!'

'বাজারে আজ মাছ পেলাম না তো।'

'বাজারে আজ মাছ নেই!'

'একটা মাছও দেখলাম না। শুনলাম, মাছ বিক্রেতাদের নাকি কীসের একটা স্ট্রাইক চলছে।'

'ঠিক আছে, ফ্রিজে কিছু মাংস আছে, তাই দিয়ে চালিয়ে নেব আজ।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়, নাকি! ভাবলাম, মাছ পেলাম না। তোমার দুই ছেলেমেয়ে ভার্সিটি থেকে বাসায় এসে মাছ না পেয়ে কী না কী করে বসে! ওরা যা মাছপাগল! মাছ ছাড়া ওরা ভাতই খেতে চায় না।'

'ফায়াজ আর দিনা কিন্তু ইদানীং মাংসও পছন্দ করে।' মাখরাজ মুৎসুদ্দীর হাত থেকে বাজারের ব্যাগটা নিয়ে ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'আপনি বাজার থেকে এসেই তো এক কাপ চা খেতে পছন্দ করেন। চা খাবেন তো! আমি চা নিয়ে আসছি।'

দুই ঠোঁট পরস্পর চাটতে চাটতে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'লাগবে না, বাজার থেকে চা খেয়ে এসেছি।'

শাক বোঝাই ব্যাগ হাতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন ফেরদৌসী বেগম। পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে নিজের রুমের দিকে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। মনটা আনন্দে নাচছে তার। পা ধোয়ার উছিলায় বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হিসাব করে ফেললেন দ্রুত। মাছের দাম জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি, এক দাম চেয়েছিল আট শ' টাকা, এই মাছ না কেনা এবং প্রতিটি জিনিস এক শ' গ্রাম কম কেনা বাবদ পুরো নয় শ' সত্তর টাকা বাঁচিয়েছেন তিনি আজ।

শব্দ করে হাসতে ইচ্ছে হলো মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। কিন্তু হাসতে নিয়েই মুখে হাত চাপা দিলেন। হাসি তবুও বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওই হাতের ওপর আরেক হাত চাপা দিলেন তিনি।

দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমানোর অভ্যাস মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। বিকেলের নামাজের আগ পর্যন্ত ঘণ্টা দুয়েকের একটা ঘুম দেন তিনি। কিন্তু আজ ঘুম আসছে না তার। জানালা খোলা, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি স্থির হয়ে। রাস্তার ওপাশে খায়ের পাটোয়ারীর প্লটে কাজ হচ্ছে, শব্দ হচ্ছে সেখানে, কান পেতে তিনি তাই শুনছেন। প্রতিটা শব্দ যতটা না তার মগজে আঘাত করছে, তার চেয়ে বেশি করছে বুকে।

বাঁ বুকে হাত রাখলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। লাফাচ্ছে বেশ জায়গাটা। ব্যথাও করছে একটু একটু। তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী খায়ের পাটোয়ারী আর তিনি একসঙ্গে প্লট কিনেছেন। টিনশেড করে সেই প্লটে তিনি বাসও করে আসছেন কয়েক বছর হলো, বাড়ি করার সামর্থ্য হয়নি। কিন্তু খায়ের পাটোয়ারী কিনা এত দিন প্লটটা খালি রেখে বাড়ি করা শুরু করেছেন আজ। না, তিনি তা কিছুতেই মানতে পারছেন না। খায়ের পাটোয়ারী বাড়ি করে দোতলা কিংবা তিনতলায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাবে, আর তিনি তখন টিনশেডের নিচ থেকে তার সেই হাত-পা ছড়ানো দেখবেন! না, সেটা হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না!

চার বছর আগে চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন তিনি। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর চাকরি শেষে এককালীন যা টাকা পেয়েছিলেন, সব দিয়ে সঞ্চয়পত্র কিনেছেন। সেই সঞ্চয়পত্র থেকে যা ইন্টারেস্ট আসে প্রতি মাসে, তা দিয়ে সংসার বেশ ভালোই চলে যায়। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, একমাত্র ছেলে আর ছোট মেয়েটা ভার্সিটিতে পড়ে। ছেলেটা তার অর্ধেক খরচ একটা কোচিং সেন্টারে পড়িয়ে জোগাড় করে, মেয়েটাও একটা দৈনিক পত্রিকায় কী সব লিখে মাস শেষে চার-পাঁচ হাজার টাকা পায়, সেটা দিয়ে সে চালিয়ে নেয় নিজেকে। কোনো মাসে বেশি লাগলে তখন কিছু দিতে হয় তাকে। ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় যেটাতে, সেই বাড়ি ভাড়া যেহেতু দিতে হয় না, সুতরাং দিন-কাল ভালোই কেটে যাচ্ছিল। আজ থেকে সেটা আর হচ্ছে না। সঞ্চয়পত্রের ইন্টারেস্ট ছাড়া যেহেতু তার আর কোনো আয়

নেই, সুতরাং এই আয় থেকেই বাঁচিয়ে বাড়ি করতে হবে তাকে। প্রয়োজন হলে কিছু লোন নেবেন ব্যাংক থেকে। তাতে পাঁচতলা-ছয়তলা না হোক, অন্তত দোতলা পর্যন্ত করতে পারলেই আপাতত শান্তি।

দু'হাত দিয়ে জানালার গ্রিল চেপে ধরে সেখানে কপাল ঠেকালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কপালের মাঝখানটা একটু পর পর দপদপ করে উঠছে। ঘাড়টাও ব্যথা ব্যথা করছে। প্রেসার বাড়ার লক্ষণ এটা। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। না, প্রেসার বাড়ানো যাবে না। প্রেমার বাড়া মানে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ। সুতরাং সাবধান।

বিছানায় এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। বিঘা তিনেক জমি আছে গ্রামে। ধান-পাট হয় সেখানে। বছরে হাজার পঁচিশেক টাকা পাওয়া যায় সেখান থেকে। ভাবলেন, জমিগুলো বিক্রি করে দেবেন। শহরে বড় হওয়া ছেলে-মেয়েরা কখনো গ্রামেও যাবে না, জমিও চিনে রাখবে না, শেষে সেটা বে-হাত হয়ে যাবে। তার আগে বিক্রি করে ফেলাই ভালো। নগদ যা পাওয়া যাবে, এখানে বাড়ির একটা অংশে কাজে লাগবে তা।

বুকের ভেতরে হঠাৎ শান্তি শান্তি ভাব জেগে উঠল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। ছেলে-মেয়ে এখনো ভার্সিটি থেকে বাসায় ফেরেনি। ড্রইংরুম থেকে টিভির শব্দ আসছে, তার মানে স্ত্রী সেখানে আছে, বাংলা কিংবা হিন্দি সিরিয়ালে ডুবে আছে মুগ্ধ হয়ে।

শব্দ করে ড্রইংরুমে ঢুকলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ঝট করে স্ত্রীর পাশে বসে বললেন, 'এক কাপ চা দাও তো ফেরদৌসী?'

'এ সময় তো আপনি চা খান না।'

'খাই না, আজ খাব।'

'একটু বসেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিরিয়ালটা শেষ হয়ে যাবে।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী স্ত্রীর পাশে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখতে দেখতে বললেন, 'ওইসব ওজনদার মহিলাদের দেখে কী আনন্দ পাও বলো তো?'

টিভি থেকে এক মুহূর্ত চোখ না সরিয়ে ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'আপনি ওজনদার মহিলা পেলেন কোথায়! ওরা তো কত স্লিম!'

'ওরা যে স্লিম, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু একেকজন নাকে-কানে-গলায়, হাত-পায়ে-নখে যে পরিমাণ গয়না লাগিয়েছে, আর সারা শরীরে

যেভাবে মোটা মোটা জড়িদারের কাপড় পেঁচিয়ে রেখেছে, তাতে ওজন তো ডাবল হয়ে গেছে, কারো কারো তিন ডাবল!'

'তবুও ভালো লাগে ওদের।' টিভির দিকেই তাকিয়ে আছেন ফেরদৌসী বেগম।

'আমারও ভালো লাগে। ওই রকম ঠোঁটপালিশ, নখপালিশ, গালপালিশ মেখে রান্না করলে, ঘরের ভেতর ঘুরঘুর করতে দেখলে ভালোই লাগে।' স্ত্রীর আরো কাছ ঘেঁষে বসলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'আচ্ছা, তুমি কি কখনো ওইরকম আগা-মাথা সেজে রান্না করতে পারবে?'

'চেষ্টা করে তো কখনো দেখিনি, কাল থেকে চেষ্টা করে দেখব।' সিরিয়াল শেষ, সোফা থেকে উঠতে উঠতে ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'বাজার থেকে কাল গয়নাগাটি, শাড়ি, কসমেটিকস কিনে আনবেন, দেখি ওসব পরে রান্না করতে পারি কি না!'

মুখের পূর্ণ হাসিটা কেমন যেন টিভি অফ হওয়ার মতো নিভে গেল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছেন ফেরদৌসী বেগম, দ্রুত তার পেছনে যেতে যেতে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'ওরা তো সব নাক বোঁচা, চোখ ছোট, ঠোঁট মোটা মেয়ে মানুষ। ওদেরকে একটু ভালো দেখার জন্য ওইসব ছাইপাশ মাখে।' স্ত্রীর একটা হাত টেনে ধরেন তিনি। ঠোঁট বিস্তৃত করে একটা হাসি দিয়ে বলেন, 'তুমি ওইসব না মাখলেও চলবে, তোমাকে এমনিতেই অনেক সুন্দর লাগে!'

হাঁটা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ফেরদৌসী বেগম। স্বামীর মুখের দিকে চোখ সরু করে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার মাথা-মুথা ঠিক আছে তো!'

'আছে।' মুখে হাসি নিয়েই মাখরাজ মুৎসুদ্দী সামনের দিকে তাকালেন। স্ত্রী রান্নাঘরের ভেতর চলে গেছে। মুখের হাসিটা আবার নিভে ফেললেন তিনি। মনে মনে বললেন — বউ রে, আমার মাথা-মুথা ঠিক নাই। বাড়ি না করা পর্যন্ত ঠিক হবে বলেও মনে হয় না।

রান্নাঘর থেকে ফেরদৌসী বেগম শব্দ করে বললেন, 'চা খাবেন, চিনি তো নাই। সকালে শেষ হয়ে গেছে, মনে ছিল না বলতে।'

'সামনের ওই দোকান থেকে আমি এখনই নিয়ে আসছি।' কথাটা বলেই আলতো করে জিভ কাটলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দ্রুত রান্নাঘরে স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'থাক, চিনি লাগবে না। অনেকেই তো চিনি ছাড়া চা খায়। আজ আমাকেও দাও এক কাপ, দেখি কেমন লাগে।'

তারপর আবারও মনে মনে বললেন—বউ রে, চিনি কিনতে গেলেই তো টাকা খরচ হবে, আর ওই চিনি দিয়ে চা যে স্বাদ হবে, তা আমার কাছে বিস্বাদই লাগবে। সুতরাং চিনি ছাড়া বিস্বাদ চা-ই ভালো।

সন্ধ্যার পরপরই তিন নম্বর রোডের সুবল ভৌমিক স্ত্রীকে নিয়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর বাসায় এলেন। বেডরুমে ধুম মেরে বসে ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী আর খায়ের পাটোয়ারীর কথা চিন্তা করছিলেন। ফেরদৌসী বেগমের পায়ের শব্দে চমকে উঠলেন তিনি। স্বামীর একেবারে কাছ ঘেঁষে বসে ফিসফিস করে বললেন, 'বিকেলে তো চিনি ছাড়াই চা খেলেন, চিনি আনলেন না। সুবলদা এসেছেন বৌদিকে নিয়ে। এখন তাদের চা দিতে হবে না! যান, চিনি নিয়ে আসেন।'

মাথাটা টনটন করছিল এতক্ষণ, সারা শরীর টনটন শুরু করে দিল হঠাৎ। মাখরাজ মুৎসুদ্দী কয়েক সেকেন্ড ভাবলেশহীনভাবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। কপালের মাঝখানে হাতড়ে তালু দিয়ে চটচট করে থাপ্পড় মেরে কাতর গলায় বললেন, 'চিনি আনতেই হবে?'

'ওনাদের চা দিতে হবে না! ওনারা কি প্রতিদিন আমাদের বাসায় আসেন নাকি! কত দিন পর এলেন।'

স্ত্রীর দিক থেকে মুখ সরিয়ে বিরক্তির স্বরে বললেন, 'কেন এসেছে?'

'তার আমি কি জানি! এমনি এসেছে। মানুষ মানুষের বাড়ি বেড়াতে আসে না। এর আগেও তো ওনারা কয়েকবার এসেছেন আমাদের বাড়িতে।' ফেরদৌসী বেগম বিছানা থেকে উঠে যেতে যেতে বললেন, 'যান, চিনি নিয়ে আসেন। ওনারা ড্রইংরুমে বসে আছেন, আপনি পেছনের দরজা দিয়ে যান।'

বেলালের দোকানে এসে মাখরাজ মুৎসুদ্দী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'তোমার দোকানে কি চিনি আছে বেলাল?'

'স্যার, আমি তো চিনি বেচি না।' কাত হয়ে ছিল বেলাল, সোজা হয়ে বসে সে বলল, 'আপনি হাঁপাইতেছেন কেন?'

'আর বলো না। বাসায় গেস্ট এসেছে। চা খাবে, কিন্তু চিনি নাই। প্রতিদিন বাসার সামনে খালি রিকশা নিয়ে রিকশাওয়ালারা মশা মারে, আজ দেখি একটা রিকশাও নাই। তাই দৌড়ে আসতে হয়েছে।' চমৎকার করে মিথ্যা বলতে পেরে বেশ চমৎকৃত হলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বাসা থেকে বের হতেই এক রিকশাওয়ালা এগিয়ে এসেছিল তার দিকে। তিনি বলেছিলেন,

'বাবা রে, আমি তো এক্সারসাইজ করতে বাসা থেকে বের হয়েছি। ঘণ্টা খানেক হাঁটব। ডাক্তার প্রতিদিন হাঁটতে বলেছেন।'

বেলাল খুব আন্তরিক গলায় বলল, 'স্যার, আমি অন্য দোকান থেকে চিনি এনে দেই।'

'কিন্তু — ।' কথা শেষ করলেন না মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

'বুঝছি তো।' হাসতে থাকে বেলাল, 'এক শ' গ্রাম কম আনতে হবে।'

শরমিন্দা হাসি দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তুমি অনেক বুদ্ধিমান, বেলাল। তোমার মাথা ভরা বুদ্ধি, নাকি!'

হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিল বেলাল। কী একটা কথা মনে পড়ায় মাখরাজ মুৎসুদ্দীও হাঁটতে লাগলেন ওর পেছন পেছন। বেলাল টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'কিছু বলবেন, স্যার?'

শরমিন্দা হাসি মুখে নিয়েই আশপাশটা একবার দেখে নিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। নিকটে কেউ নেই। মাথা ঝুঁকিয়ে, গলাটা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'যে দোকানে চিনি আনতে যাচ্ছ, ওই দোকানে কি স্যাকারিন পাওয়া যায়?'

'জি, পাওয়া যায়।'

'দশ টাকার স্যাকারিন আনতে পারবে?'

'জি পারব। স্যার — ।' বেলাল আরো একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'যদি স্যাকারিনই নেন, তাহলে নয় শ' গ্রাম চিনি নেওয়ার দরকার কি? হাফ কেজির বদলে চার শ' পঞ্চাশ গ্রাম নিলেই হয়।

'থ্যাংক ইউ বেলাল।' বেলালের দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করতে করতে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'তুমি আসলেই অনেক বুদ্ধিমান। তুমি শুধু বুদ্ধিমানই না, জ্ঞানীও। ভালো করে লেখাপড়া করলে তুমি আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী হতে পারতে একদিন।'

পেছনের দরজা দিয়েই বাসায় ফিরলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন, চুলার উপর চা পাতা ফুটছে। দরজার দিকে তাকালেন তিনি। ফেরদৌসী বেগম মুগ্ধ হয়ে গল্প করছেন সুবলদা আর বৌদির সঙ্গে।

দ্রুত চিনির প্যাকেটটা খুললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, রেখে দিলেন তা পাশে। পকেট থেকে কাগজে মোড়ানো স্যাকারিন বের করে কয়েকটা ঢেলে দিলেন চায়ের পাতিলে। ফুটন্ত চায়ের পানি চামচে নিয়ে ফুঁ দিয়ে মুখে দিলেন। মিষ্টি কম হয়েছে। আরো কয়েকটা ফেললেন পাতিলে। পানি আবার মুখে দিয়ে সন্তুষ্টি আনলেন চেহারায় — যাক, বেশ মিষ্টি হয়েছে

এবার। কাগজে মুড়িয়ে স্যাকারিন আবার পকেটে ভরে বের হয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে।

পায়ের শব্দ পেয়ে ড্রইংরুম থেকে ভেতরে এলেন ফেরদৌসী বেগম। হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তুমি ওদের সঙ্গে গল্প করছিলে দেখে একটা কাজ করে ফেলেছি আমি।'

কিছুটা উদ্বিগ্ন হলেন ফেরদৌসী বেগম, 'কী কাজ?'

'চায়ের পাতিলে চিনি দিয়ে ফেলেছি।'

হেসে ফেললেন ফেরদৌসী বেগম, 'চিনি কি চায়ের পাতিলে দিতে হয়! চা ছেঁকে কাপে দিতে হয়।' পাতিল থেকে চামচে পানি নিয়ে মুখে দিলেন তিনি, 'চিনি অবশ্য একটু কম হয়েছে। সুবলদা অবশ্য এ রকম মিষ্টিই খান। যান, ওনাদের সঙ্গে গল্প করেন আপনি। চা বানিয়ে আনছি আমি।'

ড্রইংরুমে যেতে নিয়েই বেডরুমে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বাথরুমে যেতে হবে তাকে এখন। অন্য কোনো কাজে নয়, হাসতে। চিনি বাঁচিয়েছেন, মানে টাকা বাঁচিয়েছেন! এই আনন্দে তিনি বাথরুমে ঢুকলেন তিনি। হাসতে লাগলেন তিনি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত।

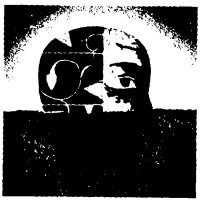

বালিশের পাশে রাখা মোবাইলটা টিপে সময় দেখে নিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী—রাত একটা বেজে চল্লিশ মিনিট। অন্যান্য দিন এই সময় ঘুমে অচেতন হয়ে যান তিনি। আজ ঘুম আসছে না। দুটো কারণে। এক. ভার্সিটি থেকে রাতে বাসায় ফিরে ফায়াজ বলেছিল, বাবা, খায়ের আংকেল তো বাড়ি শুরু করে দিল দেখলাম। আমরা কি পিছিয়ে গেলাম তাহলে? তখন থেকে বুকের ভেতর বাজছে কথাটা। দুই. গোপন একটা কাজ করবেন তিনি একটু পর। কাজটা এই মাঝরাতেই করতে হবে। এর আগে বা পরে করা যাবে না, করা ঠিকও হবে না।

নিঃশব্দে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। ফেরদৌসী বেগম কাত হয়ে শুয়ে আছেন ওদিকে। চেহারা দেখা যাচ্ছে না তার। চোখ বুজে আছেন তিনি, না খোলা রেখে সব কিছু খেয়াল করছেন—বোঝা যাচ্ছে না তা। যদিও এত রাতে না ঘুমিয়ে থাকার কোনো কারণ নেই। মাখরাজ মুৎসুদ্দী নিজে জেগে আছেন, তাই পাশেরজনকেও জেগে থাকা মনে হচ্ছে তার।

স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে উঁকি দিয়ে চেহারাটা দেখার চেষ্টা করলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। অন্ধকার ঘর, ভালো করে বুঝতে পারলেন না কোনো কিছু। সোজা হয়ে বসলেন আবার। ফেরদৌসী বেগম আসলে জেগে নেই, তবু মনটা কেমন যেন করছে। তার দিকে আবার ঝুঁকে ডান হাতের তালুটা নাকের কাছে আনলেন। কয়েক সেকেন্ড স্থির করে রাখলেন সেখানে। গভীর শ্বাস ছাড়ছেন তিনি একটু পরপর।

হাত সরিয়ে আনলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। স্থির হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন বিছানায়। ফেরদৌসী বেগম খুক করে কেশে উঠলেন হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন তিনি। আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাতেই চমকে উঠলেন আবারও। ওপাশ থেকে এদিকে কাত হচ্ছেন। কাত হয়েই গালের নিচে একটা হাত নিয়ে আয়েশ করে ঘুমাতে লাগলেন আবার।

বুকের ভেতরটা ধুকধুক করছে এখনো। আরো কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে বিছানা থেকে পা নামালেন তিনি। স্যান্ডেল জোড়া পায়ে দিতেই টের পেলেন, এটা তার নিজের স্যান্ডেল না, স্ত্রীর। পা বের করে ডান পাশে রাখলেন, না নেই। বাম পাশে রাখলেন, নেই। কপাল কুঁচকে ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, রাতে শেষবার যখন স্যান্ডেল খুলে বাথরুমে গিয়েছিলেন, বের হওয়ার হওয়ার পর সেখানেই রেখে বিছানায় উঠেছেন।

বাথরুমের সামনে এসে পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। পা টিপে টিপে রুম থেকে বের হতেই চমকে উঠলেন আবার। বাম পাশে ফায়াজের রুম, হাসির শব্দ আসছে সেখান থেকে।

মেরুদণ্ড বরাবর ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। চোখ দুটোও বড় বড় করে ফেলেছেন তিনি। এত রাতে হাসির শব্দ! মোবাইলে কারো সঙ্গে কথা বলছে নাকি ও এই মাঝরাতে!

ফায়াজের রুমের দরজার দিকে একটু এগিয়ে গেলেন তিনি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে রইলেন সেখানে। না, আর কোনো শব্দ আসছে না ভেতর থেকে। তবু তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন আগের মতো।

কিছুক্ষণ পর সরে আসতে যাচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ঠিক তখনই একটা শব্দ এলো ঘরের ভেতর থেকে। কী যেন বলল ফায়াজ। তিনি আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে। বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছে ফায়াজ। একটু পর পর হেসেও উঠছে।

দরজায় আলতো করে চাপ দিলেন তিনি। ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো নেই, ফাঁক হয়ে গেল দরজা। খুব সতর্কভাবে, কোনোরকম যেন শব্দ না হয়, দরজাটা ঠেলতে লাগলেন আস্তে আস্তে। মাথা ঢোকানোর মতো ফাঁক হতেই থেমে গেলেন তিনি। আরো একটু সতর্কতা অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। কথা থেমে গেছে ভেতরে। শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে ফায়াজের। একটু পর পর গলার ভেতর থেকে কেমন শব্দও বের হচ্ছে তার।

মাথাটা আলতো করে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে। ফায়াজের খাটের দিকে তাকালেন চোখ মেলে। জানালার ওপরের দিকটা খোলা। পাশের বাসায় জ্বালিয়ে রাখা লাইটের আভা আলোতে দেখতে পেলেন, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে হাত-পা ছড়িয়ে। গভীর ঘুম। বুক ওঠানামা করছে সমান তালে। হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল সে। মুখ চেপে হেসে উঠলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দীও — যাক, এই রাত-বিরাতে পয়সা

খরচ করে ছেলেটা কারো সঙ্গে ফুসুর ফুসুর করছে না! শান্তি। ঘুমের মধ্যে হাসছে আর কথা বলছে।

মাথা বের করে আগের মতোই সতর্কতা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দু'হাত পরস্পর ঘষে ঘুরে দাঁড়ালেন তারপর। চারদিকে সুনসান নীরবতা, নিকষ অন্ধকারও। কেউ জেগে নেই, কেবল তিনি ছাড়া।

রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন আবারও। একটা তেলাপোকা বিড়বিড় করে চলে গেল পায়ের ওপর দিয়ে। সারাদিন তেলাপোকার কোনো দেখা নেই। রাত হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয়ে আসে এখান থেকে ওখান থেকে। মাঝে মাঝে তেলাপোকা মারার চক লাগানো হয় ঘরে। সকালে উঠে দেখা যায় কয়েক শ' ছোট-বড় তেলাপোকা মরে পড়ে আছে মেঝেতে। কালো হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটতেও দেখা যায় কতগুলোকে।

রান্নাঘরের বাম পাশে একটা সেলফ আছে, তার ওপর বাজার ভরে আনা পাতলা কাপড়ের ব্যাগ থাকে। দিনের বেলা দেখেছেন, অনেকগুলো ব্যাগ জড়ো করে রাখা হয়েছে সেখানে। একটা ব্যাগ নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন সেদিকে। অন্ধকারের মাঝেও একটা ব্যাগ হাতে পেয়ে বেশ খুশি হলেন মনে মনে।

ডাইনিং রুমের কোনায় ফ্রিজ রাখা আছে, আস্তে আস্তে সেদিকে হেঁটে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে আশপাশটা ভালো করে দেখে নিলেন আবার। না, কেউ নেই। বিছানা থেকে নামার পর মাখরাজ মুৎসুদ্দীর কেবলই মনে হচ্ছে, কেউ একজন তার সব কর্মকাণ্ড দেখছে, একটু পর পেছন থেকে জাপটে ধরবে তাকে।

ফ্রিজের হাতলে হাত দিতে নিতেই থেমে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। পেছনের দিকে ঘুরে তাকালেন ঝট করে। মনে মনে যা ভেবেছিলেন, তা না। কেউ নেই পেছনে।

হাতলে হাত রেখে টান দিয়ে খুলে ফেললেন তিনি ফ্রিজটা, বন্ধও করে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে। ধক করে উঠেছে বুকের ভেতরটা। ফ্রিজ খুললেই যে ফ্রিজের লাইট জ্বলে উঠবে, এটা খেয়াল ছিল না মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। এই নিকষ কালো রাতে সামান্য আলোও যে কারো চোখে পড়তে পারে।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি। ফ্রিজ তাকে খুলতেই হবে। এই যে এত রাত পর্যন্ত জেগে আছে, তা এই

ফ্রিজ খোলার জন্য। কিন্তু ফ্রিজ খুললেই যে আলো জ্বলে উঠবে, চোখে পড়ে যেতে যে কারো।

দুই ঠোঁট পরস্পর চেপে ধরে ভাবতে লাগলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কী করা যায়? ডাইনিং রুমের দেয়ালে বড় একটা কাপড় নড়তে দেখলেন হঠাৎ। দ্রুত কাছে গেলেন দেয়ালের। ফেরদৌসী বেগমের শাড়ি ঝুলানো আছে দেয়ালে টানানো দড়ির সঙ্গে। আস্তে করে কাপড়টা নামালেন তিনি সেখান থেকে। তারপর চার ভাঁজ করে এগিয়ে এলেন আবার ফ্রিজের দিকে।

ফ্রিজের দরজার সামনে এসে ভাঁজ করা কাপড়টা মেলে ধরলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দু'হাত দিয়ে দু'দিকে প্রসারিত করে ডান হাতটা আস্তে আস্তে এগিয়ে দিলেন হাতলের দিকে। ফ্রিজটা খুললেন, পেছনের দিকে তাকালেন তার পরপরই। না, কাপড় ভেদ করে আলো তেমন ছড়াতে পারেনি ঘরে। ছোট্ট করে একটা শ্বাস ছাড়লেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে।

হাঁটু দিয়ে দরজাটা চেপে ধরে ফ্রিজে সবজি রাখার ড্রয়ারটা খুলে ফেললেন ডান হাত দিয়ে। সকালে বাজার থেকে আনা প্রায় সব কিছুই রয়েছে — আলু, বেগুন, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা পেপে, পোটল, গাজর, স-ব। দ্রুত তিনি সেখান থেকে পাঁচ-ছয়টা আলু, বড় একটা বেগুন, আট-নয়টা পেঁয়াজ, রসুন, মাঝারি সাইজের একটা কাঁচা পেপে, চার-পাঁচটা গাজর নিয়ে ওই সবজির ব্যাগে ভরলেন, হাঁটু দিয়ে ঠেলে তারপর বন্ধ করে দিলেন ফ্রিজের দরজাটা।

হাত দিয়ে ব্যাগটা একটু উঁচু করে সবজির ওজন পরিমাপ করার চেষ্টা করলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দুই কেজির একটু বেশিই হবে। বুকের ভেতর আনন্দ উথলে উঠছে। আরো আনন্দ হতো যদি ফ্রিজের উপরের দরজাটা খুলে একটা মাছ অথবা মাংসের প্যাকেট সরাতে পারতেন। কিন্তু মাছ-মাংস বেশিক্ষণ ফ্রিজের বাইরে রাখা কঠিন, নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে।

স্ত্রীর কাপড়টা দেয়ালের দড়িতে রেখে সবজির ব্যাগটা নিয়ে বাসার পেছনের দরজার কাছে চলে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। টুক করে ছিটকিনিটা খুলে দরজার পাশে বারান্দায় এলেন। অনেকগুলো প্লাস্টিকের ছোট ছোট খালি ড্রাম রাখা আছে এখানে। তার একটা ঢাকনা তুলে ভেতরে রেখে দিলেন সবজির ব্যাগটা।

এই বারান্দা থেকে খায়ের পাটোয়ারীর প্লটটা স্পষ্ট দেখা যায়। মনে মনে স্থির করে ফেললেন, ওদিকে তাকাবেন না তিনি। রুমে ফিরে আসতে

নিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন প্লটটার দিকে। বুকের ভেতরে চিনচিন ব্যথা শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে। লম্বালম্বিভাবে মোড়ানো অনেকগুলো রড আর বালি পড়ে আছে এক কোনায়। সারি সারি ইটও রাখা আছে আরেক পাশে। চাঁদের আলোয় রড আর বালিগুলো চিকচিক করছে। ইটগুলোকে মনে হচ্ছে সোনার বিস্কুট। একটু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে, হাত বুলাতে ইচ্ছে করছে সেগুলোর ওপর।

বেশ কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দরজা বন্ধ করে রুমে ফিরে এলেন তারপর। সারাদিন তিনি অনেক কষ্টের মাঝেও একেকটা পরিকল্পনা শেষ করে হাসার চেষ্টা করেছেন। হেসেছেনও। কিন্তু এখন তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। চিৎকার করে কিছুক্ষণ কাঁদতে পারলে যেমন বুকের ভেতরের সব গরম বের করে দিতে পারতেন, শান্ত হয়ে ঘুমাতেও পারতেন কিছুক্ষণ। বিছানায় শুয়ে তিনি উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছাদের দিকে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না সেখানে; তবুও তাকিয়ে রইলেন স্থির চোখে, শান্ত চোখে।

দিনা ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করতে করতে রুমের বাইরে এসে বলল, 'আম্মা, আমার টেবিল ঘড়ির ব্যাটারি খুলে রেখেছে কে?'

মেয়ের চিৎকার শুনে রান্নাঘর থেকে এগিয়ে এলেন ফেরদৌসী বেগম। আঁচলে হাতের পানি মুছতে মুছতে বললেন, 'তোর ঘড়ির আবার ব্যাটারি খুলে রাখবে কে! সুমিও তো ছুটি দিয়ে ওদের বাড়িতে গেছে। তোর ঘরে আর যায়ইবা কে?'

'আমারও তো একই প্রশ্ন।' দিনা মাথার চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'আজ সকাল দশটা বিশ মিনিটে ইম্পর্ট্যান্ট একটা ক্লাস ছিল ভার্সিটিতে। এখন বাজে সাড়ে এগারোটা।'

'আমি তো ভেবেছি আজ তোর কোনো ক্লাস নেই। তাই ঘুমাচ্ছিস। ক্লাস না থাকলে তুই তো সকালে ঘুম থেকে উঠিস না।'

'ঘড়িতে তো অ্যালার্ম দিয়ে রাখি না আমি। রাতে মোবাইলও বন্ধ থাকে। মাথার কাছে টেবিল ঘড়িটা এমনভাবে রাখি, যাতে ঘুম ভাঙলেই চোখে পড়ে। আজও ঘুম ভাঙার পর ঘড়ির দিকে তাকাই। দেখি, সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। ভাবলাম, ভার্সিটি যেতে লাগে পঁচিশ মিনিট, ভার্সিটির বাসও আসবে সাড়ে নয়টায়, আরো একটু ঘুমিয়ে নেই। কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙে দেখি, ওই সাতটা পাঁচই বাজে।'

'তার মানে ব্যাটারি যে-ই খুলুক সেই সাতটা পাঁচই খুলেছে। কিন্তু — ।' ফেরদৌসী বেগম আরো একটু এগিয়ে আসেন দিনার দিকে, 'আমার মাথায়ই তো আসছে না ব্যাটারি খুলবে কে? আচ্ছা, এমনি এমনি খুলে গেল না তো!'

'ঘড়ির ব্যাটারি কখনো এমনি এমনি খোলে! অনেক সময় টেনেই খোলা যায় না।' দিনা ওর মাথার চুল আবার পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'কী যে একটা সমস্যা হয়ে গেল!'

'কি রে — ।' ফেরদৌসী বেগম ঝট করে ডাইনিং রুমের দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন, 'ওই ঘড়িতেও তো সাতটা বেজে তিন

মিনিট দেখাচ্ছে। সেকেন্ডের কাঁটা থেমে আছে ওটার। ওটারও ব্যাটারি খোলা নাকি!'

কপাল কুঁচকে ফেলল দিনা, 'হ্যাঁ, ব্যাটারি তো খোলাই মনে হচ্ছে।'

'তোর ঘড়িতে সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট, এই ঘড়িতে সাতটা বেজে তিন মিনিট, তার মানে ঘড়ির ব্যাটারি যেই খুলুক— ।' ফেরদৌসী বেগম আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, 'ওই একই সময়ের মধ্যে খুলেছে।'

ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ার টেনে বসল দিনা, 'আমি আর ভাইয়া কাল ওই সময় বাসায় ছিলাম না। ভার্সিটির বাসে ছিলাম। বাসায় তখন কে ছিল আম্মা?'

'কে আর থাকবে, আমরাই ছিলাম।'

'বাইরে থেকে কেউ আসেনি?'

'না। তবে সন্ধ্যায় আগে সুবলদা আর বৌদি এসেছিলেন। সাতটার অনেক আগেই তো চলে গেছেন তারা।'

মাথা এদিক-ওদিক করতে করতে দিনা দ্বিধাজনিত গলায় বলল, 'সুবল আংকেল কখনো এ কাজ করবেন না। তিনি যে করবেন তার কোনো কারণও তো দেখছি না।'

'ধরা যাক ব্যাটারি চোরের কাজ এটা, কিন্তু ব্যাটারি খুলে তো নিয়ে যায়নি, ফেলে রেখে গেছে। ওই যে ডাইনিং রুমের ঘড়ির ব্যাটারি ফ্রিজের ওপর রেখেছে। তোর ঘরের ঘড়িরটাও বোধহয় টেবিলের ওপর ছিল। এখন তোর হাতে দেখছি।'

'চোর শুধু ব্যাটারি চুরি করতে আসবে নাকি! করলে পুরো ঘড়িটাই চুরি করবে।' হাতের ব্যাটারিটা ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখল দিনা।

'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।' হতাশ ভঙ্গিতে ফেরদৌসী বেগমও আরেকটা চেয়ার টেনে বসেন।

'ভাইয়াও তো এখনো ঘুমিয়ে আছে। ডাকো তো ওকে।'

'আমি ডাকতে পারব না। ঘুমের সময় ডাকলে বিরক্ত হয় ও।'

'এখন ঘুমের সময় নাকি!' চেয়ার থেকে উঠে ফায়াজের দরজায় নক করল দিনা, 'ভাইয়া, এগারোটা বেজে গেছে, ওঠ তো।' তারপর আস্তে করে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

দেয়ালের দিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে ফায়াজ। দিনা রুমে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়াল ওর। ঘড়ি খুঁজতে লাগল এই রুমের। কম্পিউটার টেবিলের কোনায় সেটা দেখে ছোটখাটো ধাক্কা খেল সে। এই ঘড়িটাও বন্ধ এবং এটাতেও সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট।

ঘড়িটা হাতে নিল দিনা। পেছনটা ঘুরিয়ে দেখতে হলো না, পাশেই পড়ে আছে ব্যাটারিটা। সিওর হওয়ার জন্য তবুও পেছনের দিকটা দেখল, ব্যাটারির জায়গাটা খালি।

আগের জায়গায় ঘড়িটা রেখে রুম থেকে বের হয়ে এলো দিনা। রান্নাঘরে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'ভাইয়ার টেবিল ঘড়িরও ব্যাটারি খোলা। ওই ঘড়িতেও সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। '

'আমার মাথায়ই আসছে না এই কাজটা কে করল!' ফেরদৌসী বেগম গ্যাসের চুলাটা বন্ধ করতে করতে বললেন, 'মাঝে মাঝে বাসায় আমার একা থাকতে হয়। সুমিটাও বাড়িতে গেছে। ভয়ই লাগছে।'

'বাবা কোথায়! বাবাকে তো দেখছি না।'

'সকালে বাইরে গেছে।'

'কেন?'

'বলল কী নাকি কাজ আছে।'

'বাবার আবার এত সকালে কী কাজ!' দিনা নিজের রুমের দিকে যেতেই ঘুরে দাঁড়াল, 'আম্মা, ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কী করা দরকার, বুঝতে পারছি না।'

রাতে ফ্রিজ থেকে সরানো সবজির ব্যাগটা নিয়ে বেলালের দোকানের সামনে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তাকে দেখেই বেলাল হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'স্যার, কাইল না বাজার করলেন!'

'আজ বাজার করতে আসিনি বেলাল।'

'কিন্তু হাতে তো ব্যাগ দেখছি। কী সব কিনেছেনও।'

'না, এসব কিনিনি, বাসা থেকে এনেছি, নাকি! সবজি-টবজি আছে এর ভেতর।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী ব্যাগটা বেলালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি আগে ব্যাগটা হাতে নাও। তোমার সঙ্গে গোপন একটা কথা আছে আমার, নাকি! চলো, কালকের ওই চা দোকানের সামনে যাই। আজ আমি তোমাকে চা খাওয়াব।'

ব্যাগটা হাতে নিয়ে ওটার ভেতর উঁকি দিল বেলাল, 'স্যার, এগুলা তো আমার দেওয়া সবজি। কাল নিয়ে গেলেন না! কোনো সমস্যা?'

'না, কোনো সমস্যা না। তুমি কয়েক মিনিটের জন্য আসো, নাকি! চা খেতে খেতে গল্প করি।'

চায়ের দোকানের সামনে এসে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'বেলাল, আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও। আমি কথা বলি।'

'না না, স্যার। আপনি না খেলে আমিও খাব না।' বেলাল একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি বরং আপনার গোপন কথাটা বলুন।'

ডানে-বামে তাকালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তারপর বেলালের দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমার হাতে যে সবজির ব্যাগটা দিলাম, ওই সবজিগুলো তুমিই দিয়েছ।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম!'

'ধরো, ওই সবজিগুলো তুমি কিনেছিলে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে, আমার কাছে বিক্রি করেছ ষাট কিংবা সত্তর টাকাতে, নাকি! এখন আমি তোমার কাছে পঞ্চাশ টাকা কমে বিক্রি করতে চাই। তুমি আমাকে ত্রিশ টাকাও দিতে পারো, আবার চল্লিশ টাকাও দিতে পারো।'

'এটা কেন করবেন, স্যার? আপনারা কি বাসায় সবজি খাওয়া বাদ দিয়েছেন, না অন্য কোনো কারণ আছে?'

বেলালের কাঁধে হাত রাখলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তুমি আমার আপন লোক। কারণ একটা আছে। আপাতত তোমাকে তা বলতে চাচ্ছি না। পরে অবশ্যই বলব।' মাথা নিচু করে ফেললেন তিনি, 'কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি বেলাল।'

আঁৎকে উঠল বেলাল, 'কেন?'

'আমার সামনের প্লটের মালিক বাড়ি করছে।'

'সারা রাত ভরে কাজ করেছে, লোহা-লক্কড়, হাতুরি-রডের শব্দ মাথায় ঢুকে ঘুম হয়নি আপনার।' বেলাল সহানুভূতির স্বরে বলল, 'না?'

'শব্দ শুধু মাথায়ই ঢোকেনি বেলাল, বুকেও ঢুকেছে। যাক, ওই ব্যাপারটা তুমি বুঝবে না। আমারও বাড়ি করতে হবে। বাড়ি শুরু না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নাই। প্রতিদিন একটা একটা করে ইটের টাকা জোগাড় করে হলেও বাড়ি আমাকে শুরু করতেই হবে। ভালো কথা— ।' আবার ডানে-বামে তাকালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'যদি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘড়ির ব্যাটারি খুলে রেখে আবার সকালে লাগানো হয়, তাহলে একটা ব্যাটারি যে কয়দিন কাজ করে তার চেয়ে ডাবল দিন কাজ করবে না?'

'তাই তো করার কথা।'

'এতে তো খরচও বাঁচবে।'

'তা বাঁচবে।'

'ধরো, তিনটা ব্যাটারির দাম ত্রিশ টাকা। আর একটা ইটের দাম ছয় টাকা। তাহলে ওই ত্রিশ টাকা দিয়ে পাঁচটা ইট কেনা যাবে। পাঁ-চটা ইট, যা তা কথা না। একটা ইটই যেখানে কেউ মাগনা দেয় না, সেখানে পাঁচটা ইট!' মাখরাজ মুৎসুদ্দী চেহারায় তৃপ্তি এনে বললেন, 'চলো, তোমার দোকানে যাই।'

বাজার থেকে বের হয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। পেছনে থেকে মাহবুব জাপটে ধরেছে তাকে, 'আংকেল, বাজারে এসেছিলেন? কী কিনলেন?'

'কিছু কিনি নাই।'

'কেন?'

'বাজার করতেই এসেছিলাম। কিন্তু বাজারে এসে দেখি, টাকা আনতেই ভুলে গেছি আমি।'

'অসুবিধা নাই। আমার কাছে টাকা আছে।' পকেট থেকে এক শ' টাকার দুটো নোট বের করল মাহবুব, 'এটা দিয়ে বাজার করুন। এখন কোনো টাকার দরকার নেই আমার।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী শরিমন্দা একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'তুমি খুব ভালো একজন ছেলে, নাকি! আই লাইক ইউ।' বলেই মাহবুবের হাত থেকে নোট দুটো নিয়ে নিজের পকেটে ঢোকালেন তিনি।

সন্ধ্যার আগে মাথায় বড় একটা কাপড়ের পোটলা নিয়ে বাসায় ঢুকল সুমী। রান্নাঘরে গিয়ে ফেরদৌসী বেগমকে বলল, 'খালাম্মা, দেশি মুরগির ডিম আনতে বলছিলেন না আপনে— ।' পোঁটলা বাড়িয়ে দিল সে, 'আনছি।'

পোঁটলা হাতে নিয়েই কপাল কুঁচকে ফেললেন ফেরদৌসী বেগম, 'কয়টা ডিম এনেছিস, এত ভারী যে!'

'খালি তো ডিম আনি নাই; দেশি কচুর লতা আনছি; চকির নিচে পাকা একটা কুমড়া আছিল, সেটা আনছি; কলার মোচাও আনছি একটা। আর মা কইল, সামনে শীত আসতাছে, পিঠা খাওয়ার কিছু চাইলের গুঁড়া নিয়া যা, ওগুলাও আনছি।'

'এগার-বারো বছরের একটা পিচ্চি মেয়ে, এত কিছু বয়ে আনার কী দরকার ছিল!'

'এখানে তো এত টাটকা কিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া আপনের না বাতের ব্যথা, দেশি মুরগির ডিম খাইলে নাকি বাতের ব্যথা সারে, তাই নিয়া আইছি।' সুমী উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'সব আমাগো মুরগির ডিম।'

কিছুটা মন খারাপ করে ফেললেন ফেরদৌসী বেগম। গরিব মানুষ, ডিম আর অন্যান্য জিনিসগুলো বিক্রি করলে অনেক টাকা পেত। কিন্তু মন খারাপটা বুঝতে দিলেন না তিনি ওকে। রান্নাঘরের তাকের ওপর পোঁটলাটা রেখে এগিয়ে গেলেন ওর দিকে। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'এর পর বাড়ি গেলে তোর মায়ের জন্য লাল একটা শাড়ি কিনে দেব আমি, তোর বাবার জন্য সুন্দর একটা শার্ট।' কথাগুলো শুনে দু'কান বিস্তৃত করে হাসতে থাকে সুমী।

পোঁটলা থেকে ডিমগুলো বের করে সুমীর হাতে দিলেন ফেরদৌসী বেগম। ধুয়ে ফ্রিজে রাখার জন্য বেসিনের নিচে রাখতে বললেন তাকে। প্লাস্টিকের প্যাকেটসহ ডিমগুলো বেসিনের নিচে রাখছিল সে। ঠিক সেই সময় হাই তুলতে তুলতে বেডরুম থেকে বের হচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

ঘুমাচ্ছিলেন তিনি এতক্ষণ। মুখ ধোয়ার জন্য বেসিনের দিকে যেতে নিতেই সুমীর হাতের দিকে চোখ যায় তার, সঙ্গে সঙ্গে চকচক করে ওঠে ও দুটো। দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে যান তিনি, 'এগুলো কি তুই এনেছিস সুমী?'

হাসি হাসি মুখ করে সুমী বলল, 'জি, খালুজান।'

'একটা কাজের মতো কাজ করেছিস।' ডিমগুলো ছুঁয়ে বলেন, 'তা কতগুলো এনেছিস?'

সুমী কিছু বলার আগে কিছুটা রাগী গলায় ফেরদৌসী বেগম বলেন, 'কী যা-তা বলছেন আপনি! ও গোনা জানে নাকি!'

সুমীর হাত থেকে ডিমের প্যাকেটটা হাতে নেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বেসিনের নিচে কাচের একটা বাটি আছে। প্যাকেট থেকে একটা একটা করে ডিম নিয়ে সেখানে রাখতে রাখলেন তিনি। শেষ ডিমটা রেখে বললেন, 'কি রে, উনিশটা ডিম এনেছিস, আর একটা আনলেই তো বিশটা হতো, পুরো পাঁচ হালি, নাকি! যাক, একটা কম এনেছিস, সমস্যা নেই।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'ফেরদৌসী, ফার্মের মুরগির ডিম তো আটাশ টাকা হালি। দেশি মুরগির ডিমের হালি কত?'

'আমি জানব কীভাবে, বাজারে যাই নাকি আমি!'

'দেখি, কাল বাজারে গেলে জেনে নেব।' রান্নাঘরের তাকের দিকে তাকালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'এই মিষ্টি কুমড়া, কলার মোচাও এনেছিস নাকি? খুব ভালো, খুব ভালো।'

ফায়াজ ওর রুম থেকে বের হয়ে বলল, 'বাবা, তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

বুকের ভেতর চমকে উঠল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। কোনো টাকা-পয়সাসংক্রান্ত জরুরি কথা না তো! ওটা হলে তো মুশকিল। কেবল এ মুহূর্তে না, আগামী দু-চার বছর টাকা-পয়সা নিয়ে কোনো আলাপ হবে না ছেলে-মেয়ের সঙ্গে।

ডাইনিং রুমের বেসিনে মুখ ধুতে ধুতে ফায়াজ বলল, 'আম্মা, চা দাও। চা খেতে খেতে বাবার সঙ্গে কথা বলব। ভালো কথা— ।' বেসিনের পাশে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে লাগল ফায়াজ, 'চা'তে চিনি ইদানীং কম হয় কেন আম্মা! বেশি করে চিনি দিও তো। চিনি কম হলে চাকে আর চা মনে হয় না।' ঘরে ঢুকতে নিয়েই থেমে গেল সে, 'থাক, চায়ে চিনি দিতে হবে না তোমাকে। আলাদা চিনি দিও, যার যতটুকু লাগে মিশিয়ে খাবে।'

বুকের ভেতরে যে ধুকধুকানিটা শুরু হয়েছিল, বেড়ে গেল সেটা। হঠাৎ করে স্যাকারিনের কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু এত মানুষের মাঝে চায়ে স্যাকারিন মেশাবেন তিনি কীভাবে?

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেব?' ফেরদৌসী বেগম জিজ্ঞেস করলেন।

ফায়াজ উত্তর দেওয়ার আগেই মাখরাজ মুৎসুদ্দী এগিয়ে গেলেন তার দিকে, 'চা হচ্ছে চা। এর একটা আলাদা স্বাদ আছে। এর সঙ্গে অন্য কিছু খেলে তখন আর কোনোটারই স্বাদ পাওয়া যায় না—না চায়ের স্বাদ, না বিস্কুট-চানাচুর-পাকুরা কিংবা সবজি পিঠার স্বাদ।'

'তুমি ঠিক বলেছ বাবা।' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ফায়াজ বলল, 'এখন আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি শুধু চা-ই দাও।'

দ্রুত বেডরুমে চলে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। স্টিলের আলমারির ভেতর নিজস্ব একটা ড্রয়ার আছে তার। কাগজে মোড়ানো স্যাকারিনগুলো রাখা আছে সেখানে। টুক করে আলমারিটা খুলে ছোট্ট পুঁটলিটা হাতে নিলেন তিনি। কোমরের কাছে লুঙ্গিতে রেখে বের হতে নিতেই ঘুরে দাঁড়ালেন। কাগজ খুলে পরিমাণমতো স্যাকারিন ডান হাতের দুই আঙুলের মাঝে নিয়ে আবার মুড়ে ফেললেন কাগজটা। পুঁটলিটা আবার আলমারির ড্রয়ারে রেখে বের হয়ে এলেন রুম থেকে। সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে মুগ্ধ করা চায়ের গন্ধ এলো নাকে।

ডান হাত যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে খুব ভাবলেশহীনভাবে রান্নাঘরে ঢুকলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ফেরদৌসী বেগমের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটা বিষয়ে তুমি কিন্তু খুব স্পেশাল ফেরদৌসী।'

ফিরে তাকালেন না ফেরদৌসী বেগম। চিনির কোটা খুলতে খুলতে তিনি বললেন, 'কোন বিষয়ে?'

'চা বিষয়ে।' স্ত্রীর আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন তিনি, 'তোমার হাতে বানানো চা খেয়ে সবাই কেমন মুগ্ধ হয়ে যায়। ব্যাপারটা দেখে আমিও মুগ্ধ হয়ে যাই।'

'আমি কেবল চা ভালো বানাই, আর কিছু ভালো রান্না করতে পারি না?' এবারও এদিকে ফিরে তাকান না ফেরদৌসী বেগম। একটা পিরিচে চা ঢালতে থাকেন তিনি।

'না না, আমি সেটা বলছি না। সবই ভালো রান্না করো তুমি, তার মধ্যে চা'টা স্পেশাল, নাকি!'

'তাই!' মুচকি হাসেন ফেরদৌসী বেগম। চায়ের কৌটাটা বন্ধ করতে করতে দরজার দিকে তাকান, 'সুমী— ।' গ্যাসের চুলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে বলেন, 'অ, ও তো বাথরুমে।' বলেই রান্নাঘর থেকে বের হয়ে যান তিনি। এই সুযোগটারই অপেক্ষা করছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দরজার দিকে একপলক তাকিয়ে হাতের স্যাকারিনগুলো ঢেলে দেন ফুটন্ত চায়ের পানিতে।

ডাইনিং রুমের শোকেস থেকে চায়ের কাপ নিয়ে রান্নাঘরে এলেন আবার ফেরদৌসী বেগম। দু'হাতের তালু ঘষতে ঘষতে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'দিনা কোথায়?'

'ও তো ঘুমাচ্ছে।'

'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনো ঘুমাচ্ছে! তুমি চা রেডি করে টেবিলে দাও, আমি ওকে ডেকে তুলছি।' রান্নাঘর থেকে হাসি হাসি মুখে বের হয়ে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

ফ্লাস্ক থেকে কাপে চা ঢালতে দেখে মাখরাজ মুৎসুদ্দী ফায়াজকে বললেন, 'চিনি ছাড়া চায়েরও কিন্তু আলাদা রকম মজা আছে। তুই একটা চুমক দিয়ে দেখ, অন্য রকম স্বাদ পাবি।'

বাবার কথা শুনে চায়ে চুমক দিল ফায়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং টেবিলের ওপাশে বসা ফেরদৌসী বেগমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চায়ে চিনি দিয়েছ নাকি, আম্মা? চিনি কম দেওয়ার কথা বলেছি বলে একটু বেশিই দিয়েছ।'

'চায়ে তো চিনি দেইনি আমি।' চোখ বড় বড় করে ফেললেন ফেরদৌসী বেগম, কপালও কুঁচকে ফেললেন।

'কই দাওনি, চা তো মিষ্টিতে ভরপুর হয়ে গেছে।' দিনা ঠোঁট থেকে কাপ সরাতে সরাতে বলল, 'তবে কেমন যেন একটু তিতকুটে মিষ্টি।'

দ্রুত চায়ে চুমক দিয়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'বেশি চিনি হয়েছে তো, তাই একটু তিতা তিতা লাগছে।'

এখন চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না ফেরদৌসী বেগমের। অনিচ্ছা নিয়ে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন কাপে। মুখে দিয়ে বললেন, 'চায়ের স্বাদ এ রকম কেন! মনে হচ্ছে স্যাকারিন মেশানো স্বাদ।'

'বলো কী! খাদ্যে ভেজাল মেশাতে মেশাতে এখন চিনিতেও স্যাকারিন!' হাতের কাপটা টেবিলে রাখলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'নাহ্, এখন আর কোনো কিছুই খাওয়া যাবে না। ভেজালে ভরে গেছে সারা দেশ। এখন থেকে না খেয়ে থাকার প্র্যাকটিস করতে হবে।'

চায়ে আরো একবার চুমক দিল ফায়াজ, 'না খেয়ে তো আর থাকা যাবে না, অল্প খেতে হবে, বেছে বেছে খেতে হবে।'

'রাইট। অল্প খেতে হবে। কথায় আছে না—অল্প আহার স্বাস্থ্যের সহায়ক। ধনী মানুষের বাচ্চা-কাচ্চাদের দেখো না কেমন লিকলিকে, আর ফকির-ফাকিরদের বাচ্চাদের দেখো কী নাদুস-নুদুস, নাকি! অথচ খাবার তেমন পায়-ই না। যা পায় তার সব অপুষ্টিকর, ভেজাল।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ফেরদৌসী বেগম, 'এত কথা বাদ দাও। আমার মাথায় আসছে না চায়ে চিনি বা স্যাকারিন দিল কে? কৌটা থেকে চিনি ঢেলে—।' ফ্লাস্কের পাশে রাখা চিনি বোঝাই পিরিচ দেখালেন তিনি, 'এটাতে রেখেছি। এক ফোঁটা চিনিও অন্য কোথাও রাখিনি।'

'তুমি হয়তো দিয়েছ, কিন্তু মনে নেই তোমার।' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'হয়, এ রকম হয়। মানুষ তো একটা যন্ত্রই, নাকি! যন্ত্রেরও ভুল হয়, মানুষেরও হয়।'

'না, আমার কোনো ভুল হয়নি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, চায়ে কোনো চিনি মেশাই নাই আমি।'

'পাতিলে যখন চায়ের পানি ফুটছিল, তখন দাওনি তো?' খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

'ওভাবে চিনি মেশানোর অভ্যাস নেই আমার। কাপে চা ঢেলে চিনি মেশাই আমি।'

'হ্যাঁ, আম্মা তো কাপেই চিনি মেশায়।' দিনা চায়ে চুমক দিতে দিতে বলল, 'যাই হোক, কোথাও একটা ভুল হয়েছে।'

'দুনিয়ার সব জায়গায় ভুল হতে পারে, আমার ভুল হয় নাই।'

'আচ্ছা, চা পাতার সঙ্গে চিনি জাতীয় কিছু মেশানো নাই তো! হয়তো কোনো কারণে কারখানায় বা দোকানে চিনি আর চা একসঙ্গে মিশে গেছে, তার পর সেভাবেই প্যাকেট হয়েছে।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন।

দ্রুত রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের কৌটা আনলেন ফেরদৌসী বেগম। সেখান থেকে কিছু চা নিয়ে মুখে দিলেন। দুই সেকেন্ড পর বললেন, 'কোনো চিনি-টিনি নাই এখানে। স্রেফ চা পাতাই আছে কৌটাতে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো!' মাখরাজ মুৎসুদ্দী চোখ বড় বড় করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেললেন তিনি, 'যা-ই বলো না কেন, একটা দিক থেকে ব্যাপারটা কিন্তু ভালোই হয়েছে, নাকি! চিনি খরচ হলো না আমাদের। এভাবে যদি প্রতিবার চা এমনি এমনিই মিষ্টি হয়, তাহলে কিন্তু খুবই ভালো হয়। চিনির টাকা বাঁচিয়ে ভালো কিছু করতে পারব আমরা।'

বাথরুম থেকে চিৎকার করতে করতে বাইরে বের হলো সুমী। ফেরদৌসী বেগম দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে তোর?'

পেট চেপে ধরে সুমী বলল, 'প্যাটে ব্যথা করছে খালাম্মা।'

'হঠাৎ পেটে ব্যথা হলো কীভাবে!'

'বুঝতে পারছি না।'

'বাড়ি থেকে আসার সময় কী খেয়েছিলি?'

'ভাত।'

'সঙ্গে সঙ্গে কী খেয়েছিলি?'

'মুরগির মাংস।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী এগিয়ে গেলেন সুমীর দিকে, 'বাজার থেকে মুরগি কেনা তো। কী না কী খাইয়ে বিক্রি করে ওগুলো। বিষ হয়ে যায় সব কিছু।'

'ওইটা বাজারের মুরগি ছিল না, আমাগো পালা মুরগি আছিল।' কাতরাতে কাতরাতে বলল সুমী।

মাখরাজ মুৎসুদ্দী হঠাৎ শব্দ করে ওঠেন, 'আমার পেটটাও তো ব্যথা শুরু করেছে।' পেট চেপে ধরেন তিনি, 'ও আল্লা, এত জোরে ব্যথা করছে কেন! কিছুই তো খাই নাই। দাঁড়াও, ঘরে সম্ভবত পেট ব্যথার ওষুধ আছে।' স্ত্রীর দিকে তাকান তিনি, 'গ্লাসে পানি দাও তুমি, আমি ওষুধ নিয়ে আসি।'

রুমে ঢুকেই ফিক করে হেসে ফেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। পেট ব্যথার জন্য সুমীকে যদি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে যাবে। ওষুধের বক্স থেকে রিবোফ্লোবিনের স্ট্রিপটা হাতে নিলেন তিনি। মুখের ঘায়ের ওষুধ এটা। সম্ভবত সবচেয়ে কম দাম এ ওষুধটার। ওখান থেকে দুটো ওষুধ বের করে, ওষুধের বক্সটা আগের মতো রেখে, বের হয়ে এলেন দ্রুত। ফেরদৌসী বেগমের হাত থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে নিজে একটা ওষুধ খেয়ে সুমীর সামনে গিয়ে বললেন, 'হাঁ কর।' সুমী হাঁ করতেই যতটা সম্ভব আড়াল করে ওর মুখের ভেতর বাকি রিবোফ্লোবিনটা ঢুকিয়ে দিলেন আলতো করে। তারপর নিজের গ্লাস থেকে পানি ঢেলে বললেন, 'নে, এবার গিলে ফেল।'

ফেরদৌসী বেগম জড়িয়ে ধরে আছেন সুমীকে। মাখরাজ মুৎসুদ্দী পেট চেপে ধরেই বসে পড়লেন ডাইনিংয়ের চেয়ারে। বেশ কিছুক্ষণ পর পর মুখ দিয়ে হো হো করে বাতাস বের করে দিচ্ছেন। উৎকণ্ঠা নিয়ে সামনে বসা দিনাকে ইশারা করলেন ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি দিতে, দিতে বললেন

সুমীকেও। ফ্রিজ থেকে দ্রুত পানি দিতেই সবটুকু পানি খেয়ে ফেললেন তিনি। তার দেখাদেখি খেয়ে ফেলল সুমীও।

মিনিট পাঁচেক পর পেট থেকে হাত সরিয়ে মুখটা হাসি হাসি করে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। হাসিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'যাক, ব্যথাটা কমে গেছে আমার। খুবই ভালো ওষুধ।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুমীর দিকে তাকাল। ফায়াজ ওর একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'কি রে, তোর খবর কী?'

সুমী কিছু বলার আগেই মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'ওরও ব্যথা কমে আসছে। আস্তে আস্তে কমে আসছে।' সুমীর চোখের দিকে তাকালেন তিনি, 'তাই না সুমী?'

পেট থেকে সুমীও হাত সরাল, 'খালুজানের মতো আমারও ব্যথা কমে গেছে। একটুও ব্যথা নাই আর।'

'কমতেই হবে। খুব ভালো ওষুধ তো।' মুখটা হাসি হাসি করে বেডরুমে চলে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দু'হাত এক করে মনে মনে বললেন — হে আল্লাহ, তুমি আমাকে এভাবেই খরচ কমানোর তৌফিক দিও। দ্রুত টাকা জমাতে হবে, খোদা। বাড়িটা শুরু করার সুযোগ দাও আমার মাবুদ।

রাতে খাবারে খেতে নিয়ে দিনা বলল, 'আম্মা, কাল চার-পাঁচজন বান্ধবী আসবে বাসায়। ওরা কিন্তু সারাদিন থাকবে।'

'কাল কখন আসবে?' প্লেটে ভাত নিতে নিতে ফেরদৌসী বেগম জিজ্ঞেস করলেন।

'কাল তো ভার্সিটি বন্ধ। দশটা-এগারোটার মধ্যে এসে যাবে।'

'কিছু বাজার করতে হবে তাহলে। ফ্রিজে কয়েক পদের মাছ আছে। তবু ভালো বড় একটা মাছ আনতে হবে।'

'টুম্পা কিন্তু মাছ পছন্দ করে না, আম্মা। মাংস পছন্দ ওর, তাও সব মাংস না, মুরগির মাংস।'

'ফ্রিজে তো বোধহয় মুরগির মাংস নেই, শেষ হয়ে গেছে।' মাখরাজ মুৎসুদ্দীর দিকে তাকালেন ফেরদৌসী বেগম, 'মুরগির মাংসও তো তাহলে আনতে হবে। কিন্তু ওরা যেহেতু দশটা-এগারোটার মধ্যেই আসবে, বাজার তো তাহলে রাতে করে আনলেই ভালো হতো।'

'এখন তো রাতে বাজার করা কোনো সমস্যা না, আম্মা।' প্লেট থেকে মায়ের দিকে তাকাল দিনা, 'চারপাশে শপিংমল বোঝাই হয়ে গেছে। কয়দিন আগে চার রাস্তার মোড়ে একটা হলো না। রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে সেটা।' দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল, 'এখন তো আটটা চল্লিশ বাজে। সব শপিংমলই এখন খোলা।'

'ভাত খেয়ে বাজারটা সেরে আসুন তাহলে আপনি।' মাখরাজ মুৎসুদ্দীর দিকে আবার তাকালেন ফেরদৌসী বেগম, 'রাতেই জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে পারলে কাল রান্না করতে সুবিধা হবে।'

হাতে ভাত নিয়ে মুখের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। থেমে গেলেন তিনি। ভাতগুলো প্লেটে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'আপনার আবার কী হলো!'

চেহারা বিষাদ করে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'খেতে ইচ্ছে করছে না কেন যেন।'

'পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে নাকি আবার!'

এই যুক্তিটা দেখালে ভালো হতো। কিন্তু পাশে সুমী দাঁড়িয়ে আছে, খাবারের এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। তার পেটে ব্যথা শুরু হওয়ার কথা শুনে যদি সুমীও ব্যথা শুরু হওয়ার কথা বলে! তাহলে মুশকিল হবে। ডাক্তারের কাছে যাও, ওষুধ কেনো, টাকা খরচ করো — নানা ঝামেলা।

'না এমনি। শরীরটা কেমন যেন ম্যাজমেজ করছে।'

দিনার পাশের চেয়ার থেকে উঠে এসে কপালে হাত রাখলেন ফেরদৌসী বেগম, 'শরীর কিন্তু ঠাণ্ডাই আছে। ঠিক আছে, ভাত খাওয়ার দরকার নেই। দুধ বানিয়ে দিচ্ছি, দুধ খান। গরম গরম দুধ খেলে শরীর ভালো লাগবে।'

দুধ বানানোর জন্য রান্নাঘরে যাচ্ছিলেন ফেরদৌসী বেগম, হাত টেনে ধরলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'না, দুধও খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আম্মা, বাবাকে এক গ্লস শরবত বানিয়ে দাও। লেবু আছে না, লেবু ভালো করে চিপে চিনি একটু বেশি দেবে।' দিনা বাবার দিকে তাকাল, 'লেবুতে ভিটামিন সি আছে, ভালো লাগবে তোমার।'

'না, রাত করে শরবত-টরবত খাওয়ার দরকার নেই। আমি বরং ভাতই খাই। অল্প খাব।' ভাত খাওয়া শুরু করলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। মুখে ভাত দিচ্ছেন, চাবাচ্ছেন, কিন্তু গিলতে পারছেন না। ভাত ভেতরে যাচ্ছে না, ঠেকে যাচ্ছে গলায়। চার-পাঁচজন বান্ধবী আসবে দিনার, সারাদিন থাকবে, দুপুরে ভাত খাবে, বিকেলে নাশতা, আর সারাদিন এটা-ওটা তো আছেই। এ দু'দিনে তিনি খরচ কমিয়ে যা বাঁচিয়েছিলেন, এটা-ওটা করে টাকা জমিয়েছিলেন, তার পুরোটা তো যাবেই, আরো বেশি যেতে পারে। মাথার ভেতর দপদপ শুরু হয়ে গেছে, বুকও ফেটে যেতে চাচ্ছে।

ভাত প্লেটে রেখেই হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কিন্তু চেয়ার থেকে উঠেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। চমৎকার বুদ্ধি।

দ্রুত হাত ধুয়ে বেডরুমে চলে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। গায়ের জামাটা বদলিয়ে বাইরে বের হতেই ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'শরীরটা কেমন যেন করছে। সামনের রাস্তাটায় কিছুক্ষণ হেঁটে আসি। তারপর বাজারটা সেরে আসব।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী ফায়াজের রুমের দরজার দিকে তাকালেন, 'ফায়াজকে দেখছি না তো! কোথাও গেছে নাকি?'

'রাত করে গোসল করার বাতিক আছে না ওর। গোসল করছে। এতক্ষণ তো ঘুমাল, কবে যেন পরীক্ষা, গোসল সেরে পড়তে বসবে।'

'আমি তাহলে একটু হেঁটে আসি। একটু পরেই চলে আসছি।' দরজা খুলে বাসার বাইরে চলে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

তিন রাস্তা পরে ওষুধের একটা দোকান আছে—রুমী ফার্মেসি। সামনের দিকে ওষুধের দোকান, পেছনের দিকে একটা রুম আছে, ওখানে একজন ডাক্তার বসেন, ফজলু ডাক্তার। নামের শেষে এমকিউএসপি লেখা। কোনো মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তার না, সম্ভবত কোনো প্যারামেডিক্যাল থেকেও না। কোনো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন। অর্শের চিকিৎসা থেকে শুরু করে এইডসের চিকিৎসা করেন। সর্ব রোগের ডাক্তার তিনি। মানুষজন ভালোই ফল পায় তার চিকিৎসায়। ভিজিট খুব বেশি না, এক শ' টাকা। কারো বাসায় যেতে হলে দুই শ' টাকা।

ফজলু ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কাপড় ঘেরা তার রুমের ভেতর রোগী আছে একটা। এখান থেকে সব কথা শোনা যাচ্ছে। তিন দিন ধরে কিছু খেতে পারছেন না রোগীটি, সঙ্গে আরো অনেক ছোটখাটো সমস্যা।

চার-পাঁচ মিনিট পর প্রেসক্রিপশন নিয়ে রোগীটি বের হয়ে এলে মাখরাজ মুৎসুদ্দী গেলেন ডাক্তারের সামনে। তাকে দেখেই ডাক্তার ফজলু চেহারা হাসি হাসি করে বললেন, 'আংকেল, অনেক দিন পর আসলেন আপনি! কোনো সমস্যা?'

'হ্যাঁ, জটিল একটা সমস্যায় পড়েছি আমি।'

'আগে চেয়ারে বসুন। দেখি, কোথায় সমস্যা?'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী ডান-বামে তাকালেন। কেউ নেই। একটু ঝুঁকে বসলেন তিনি ডাক্তারের দিকে। কিছুটা ফিসফিস করে বললেন, 'সমস্যা তো শরীরে না, অন্য জায়গায়।'

ফজলু ডাক্তার বেশ উৎসাহী হয়ে বললেন, 'মাথায় নাকি!'

বিরক্ত বোধ করলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, কিন্তু প্রকাশ করলেন না তা। শান্ত হয়েই বললেন, 'মাথাটা তো শরীরেই অংশ নাকি?'

ঠোঁট ফাটা হাসি দিলেন ফজলু ডাক্তার। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'জি, কথা সত্য।' হাসিটা বিস্তৃত করে ফেললেন তিনি, 'তাহলে সমস্যাটা কোথায়?' পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাখরাজ মুৎসুদ্দীর সারা শরীরে

একবার চোখ বুলালেন ফজুল ডাক্তার, 'আপনি আমার কাছে সব কিছু খুলে বলুন। কোনো লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই। যত গোপন অসুখই হোক না কেন, ইনশাআল্লাহ চিকিৎসা করতে পারব তার।'

কিছুটা কুঁকড়ে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'না না কোনো গোপন অসুখ নেই, গোপন কথা আছে। আপনি তো বাসায় গিয়ে রোগী দেখলে দুই শ' টাকা নেন। আপনাকে দুই শ' টাকাই দেওয়া হবে।'

'কার বাসায় যেতে হবে? কখন যেতে হবে?' ফজলু ডাক্তারের চোখে দুই শ' টাকার ছায়া।

মাখরাজ মুৎসুদ্দী খুব শান্ত গলায় বললেন, 'আমার বাসায়, যেতে হবে একটু পরেই।' তারপর পুরো দু' মিনিট কথা বলে, সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে, বের হয়ে এলেন তিনি ফজলু ডাক্তারের রুম থেকে।

দুই টোকা দিতেই দরজা খুলে দিলেন ফেরদৌসী বেগম। কো কো করতে ভেতরে ঢুকলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ফেরদৌসী বেগম উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, 'এমন করছেন কেন আপনি! কী হয়েছে আপনার?'

দ্রুত বেডরুমে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। এক হাতে মাথা আরেক হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, 'আমার কেমন যেন লাগছে। কোনো কিছু বুঝতে পারছি না আমি।'

'এটা আপনি কী বলছেন!' কান্নার মতো করে শব্দ করে ওঠেন ফেরদৌসী বেগম।

'আমি বোধহয় বাঁচব না ফেরদৌসী। বুকের মধ্যে কে যেন ধাক্কাচ্ছে। পেটের ভেতর কে যেন কামড়ে ধরেছে। মাথাও ফেটে যাচ্ছে।'

'ফায়াজ-দিনা...।' চিৎকার করে উঠলেন ফেরদৌসী বেগম। ওরা দৌড়ে আসতেই ফায়াজকে তিনি বললেন, 'দেখ তো তোর বাবা কেমন যেন করছে। দ্রুত একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাক্তার ডাকো।' বিছানায় কাতরাতে কাতরাতে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'ওই যে আমাদের এই রোডের তিন রোড পর রুমী ফার্মেসি আছে না, ওখানে একজন ডাক্তার বসেন, ফজুল ডাক্তার। খুব ভালো ডাক্তার। ওনাকে ডাকো।'

ফায়াজ দ্রুত বের হয়ে গেল রুম থেকে। মিনিট দশেক পর ফজলু ডাক্তার এসে সারা শরীর টিপতে লাগলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। অনেকক্ষণ টেপার তিনি বললেন, 'খালাম্মা, আপনি একটু সামনে আসুন।'

ফেরদৌসী বেগম সামনে গেলেন ফজলু ডাক্তারের। কালো একটা ব্যাগ থেকে প্যাড আর কলম বের করে ফজুল ডাক্তার বললেন, 'আংকেলের প্রচুর রেস্ট দরকার। আগামী তিন দিন বিছানা থেকে উঠতে দেবেন না তাকে। ফুল রেস্টে থাকতে হবে। কোনো রকম শব্দ বা হৈ-হুল্লোড় করা যাবে না বাসায়। টিভি চালাবেন কম শব্দে। বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে আসলেও দেখা করতে দেবেন না আংকেলকে।' প্যাডে কলম চালাতে লাগলেন ফজলু ডাক্তার, 'আমি একটা ভিটামিন লিখে দিচ্ছি, খাওয়াতে থাকুন। তিন দিনের মধ্যে আংকেল ভালো হয়ে যাবেন। তখন আমার চেম্বারে গিয়ে দেখা করেন। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেব আমি।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী ফজলু ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন, 'এই একটা ওষুধেই তো চলবে, আর কোনো লাগবে না?'

'আপাতত এই একটাই খান। তিন দিন পর বোঝা যাবে আর কী কী ওষুধ দিতে হবে।'

'থ্যাংক ইউ ডাক্তার।' ফেরদৌসী বেগমের দিকে তাকালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'ওনাকে দুই শ' টাকা দিয়ে দাও।'

ডাক্তার চলে যেতে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর পাশে বসলেন ফেরদৌসী বেগম। মাথায় হাত বুলাতে বলাতে বললেন, 'এই তিন দিন আপনি একদম নড়াচড়া করবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকবেন। বাসায় দিনার বান্ধবীদের আসার কথা ছিল, আপনার শরীর খারাপ বলে ওদের না করে দিয়েছে ও।'

'তাই নাকি!' হাসতে নিয়েই থেমে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। চোখ-মুখ শক্ত করে চেয়ে রইলেন তিনি সিলিংয়ের দিকে, কিন্তু বুকের ভেতর নাচছে তার, হাসছেও। যাক, কৌশলটা কাজে লেগেছে।

রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয়নি মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। সারারাত এপাশ-ওপাশ করেছেন, কোল বালিশ চেপে ধরেছেন, চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে পড়ে শুয়ে থেকেছেন, ঘুম আসেনি তবুও। অনেক রাত পর্যন্ত খায়ের পাটোয়ারীর প্লটে কাজ হয়েছে, তার শব্দ এসে বুকে লেগেছে, গরম হয়ে উঠেছে বুকের ভেতরটা, ঘুম হয়নি এর জন্যও। রাতে একবার মনে হয়েছিল, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে হাঁটাহাঁটি করবেন রাস্তায়, সম্ভব হয়নি এটাও।

বিছানায় উঠে বসলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কপালটা চেপে আসছে কেমন যেন। সম্ভবত ঘুম না হওয়ার জন্য এটা হয়েছে। হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরলেন তিনি। বিছানায় আরো একটু শুয়ে থাকলে ভালো লাগত। কিন্তু অনেকগুলো কাজ করতে হবে, কাজগুলো শেষ করতে হবে দ্রুত।

বিছানা থেকে পা নামাতেই ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'এত সকালে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

কিছুটা চমকে উঠলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তিনি ভেবেছিলেন, ঘুমিয়ে আছেন ফেরদৌসী বেগম। পায়ে স্যান্ডেল গলাতে গলাতে বললেন, 'শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।'

বিছানায় উঠে বসলেন ফেরদৌসী বেগমও। স্বামীর পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, 'ডাক্তার না আপনাকে রেস্ট নিতে বলেছে!'

'আর কত রেস্ট নেব! সারা রাতই তো রেস্ট নিলাম।'

'আজ সারা দিন বিছানা থেকে ওঠার দরকার নেই, শুয়ে থাকুন আপনি।'

'শুয়ে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে।'

'শরীর ভালো থাকলেও তো এত সকালে আপনি কখনো ঘুম থেকে ওঠেন না। আজ এত তাড়াতাড়ি উঠছেন কেন!'

একটু চুপ থেকে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'বাসায় কি কোনো ক্যালকুলেটর আছে?'

কপাল কুঁচকে ফেললেন ফেরদৌসী বেগম, 'এত সকালে ক্যালকুলেটর দিয়ে কী করবেন আপনি?'

'একটু দরকার আছে।'

'দিনা-ফায়াজ দুজনেরই তো ক্যালকুলেটর আছে।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী ঝট করে ঘুরে বসলেন ফেরদৌসী বেগমের দিকে, 'কারো কাছ থেকে একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে আসো না।'

'আমার মাথায় আসছে না আপনি এত সকালে ক্যালকুলেটর দিয়ে কী করবেন?' বিরক্তি নিয়ে বললন ফেরদৌসী বেগম।

হেসে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। স্ত্রীর একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'ক্যালকুলেটর দিয়ে মানুষ কী করে?'

ফেরদৌসী বেগমের চেহারায় এখনো বিরক্তি, 'হিসাব করে, এটা তো সবাই জানে, আমিও জানি।'

'আমিও হিসাব করব।'

'আপনি আবার কীসের হিসাব করবেন! শরীর অসুস্থ, এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোনো কিছুর হিসাব করতে হবে না আপনার। ঘুম যখন আসছেই না, তাহলে ওঠেন, হাত-মুখ ধোন, নাশতা দেই। খেয়ে আবার শুয়ে থাকুন।' বিছানা থেকে নামতে লাগলেন ফেরদৌসী বেগম।

বেডরুমে থেকে ড্রইংরুমে গিয়ে সুমীকে ডেকে তুললেন ফেরদৌসী বেগম। ঘুম থেকে উঠে সুমীর প্রথম কাজই হচ্ছে হাত-মুখ ধুয়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দীকে এক গ্লাস পানি দেওয়া। সুমী পানি নিয়ে এসে দেখল, বিছানায় উপুড় হয়ে ওষুধের একটা প্যাডে কলম দিয়ে কী যেন লিখছেন তিনি। ওকে দেখেই সোজা হলেন তিনি। হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে পানি শেষ করে বললেন, 'আমার সামনে একটু বোস তো।'

খালি গ্লাস হাতে নিয়েই বিছানায় বসল সুমী। মাখরাজ মুৎসুদ্দী খুব আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকালেন, 'তোকে দিয়ে আমাদের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে পাঁচজন। এই পাঁচজনের জন্য মাছের একটা তরকারি রান্না করতে কয়টা পেঁয়াজ লাগে, বল তো?'

সুমী একটু ভেবে বলল, 'বড় বড় পেঁয়াজ আনেন না আপনে, ওগুলা লাগলে তিনটা।'

'মাঝারি হলে লাগবে চারটা।'

'হ, ছোট হলে পাঁচটা।'

পেঁয়াজের হিসাবটা প্যাডে টুক করে লিখে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। আবার সুমীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দুপুরের খাবারে আমাদের পাঁচজনের চাল লাগে কতটুকু রে?'

'ছোট টিনের কৌটার দুই মগ।'

'ওই কনডেন্স মিল্কের কৌটার দুই মগ তো?'

'হ।'

'হ কী! তোকে না বলেছি হ বলবি না, জি বলবি।'

সুমী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'জি।'

'এবার আলুর হিসাব দে।'

পাঁচজন মানুষের এক বেলা খেতে কতটুকু আলু, সবজি, তেল, লবণ, মরিচ, মসলা লাগে সুমী একে একে তার হিসাব দিল। একে এক সবগুলো লিখেও ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কিছুটা তৃপ্তি নিয়ে সুমীর দিকে হাসি হাসি চেহারা করে তাকালেন, 'আমি যে সাইজের মুরগি আনি, আমাদের পাঁচজনের এক বেলা খাওয়ার জন্য তার অর্ধেক লাগে না?'

'হ— ।' জিভে ছোট্ট করে কামড় দিল সুমী, 'জি, অর্ধেক লাগে।'

'মাঝারি সাইজের একটা ইলিশ মাছ কয় বেলা যায় আমাদের?'

'তিন বেলা তো যায়-ই। ইলিশ মাছ কিন্তু আমরা চারজন খাই, খালাম্মা খায় না। ' সুমী কিছুটা বিজ্ঞের মতো বলল, 'অবশ্য খালাম্মা খাইলে ওই তিন বেলাই যাই তো। কারণ আমরা তিন বেলা খাওয়ার পর দু-এক টুকরা বাঁচে।'

'তার মানে ছয় শ' টাকা দিয়ে একটা ইলিশ মাছ কিনলে এক বেলায় লাগে দুই শ' টাকার ইলিশ। তাই না?'

'যারা লেখাপড়া করে তারা হিসাবপত্র জানে। আমি তো লেখাপড়া করি নাই খালুজান।'

কলমটা প্যাডের ওপর রেখে তৃপ্তি নিয়ে দু'হাত ঘষতে লাগলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। চেহারাটা হাসি হাসি করে ফেললেন তিনি, 'কাল রাতে দিনা কয়জন বান্ধবীর কথা বলেছিল?'

'চার-পাঁচজন।'

'চার-পাঁচজন।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী মনে মনে কী একটা হিসাব করে ফেললেন। এখন তার চেহারা না, চোখ দুটোও হাসছে। দু'হাত আবার পরস্পর ঘষে তিনি বললেন, 'চা খাবি নাকি,সুমী?'

'খালুজান, আমি তো চা খাই না।'

'খা খা। যা দুই কাপ চা বানিয়ে আন। এক কাপ আমার জন্য, আরেক কাপ তোর জন্য। দুজন আরাম করে চা খাব, আর গল্প করব। আচ্ছা— ।' দরজার দিকে তাকালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'কাল রাতে ডাক্তারকে দুই শ' টাকা দেওয়া হয়েছে না?'

'জি। খালাম্মাকে তো দুইটা এক শ' টাকার নোট দিতে দেখলাম।'

'এক বেলা ইলিশ মাছের দাম। আর বাকিটুকুই তো লাভ—মুরগি, আলু, তেল, লবণ, মরিচ, চাল, ডাল, আরো কত কি! বিকেলবেলার নাশতা, চা। ফ্রিজের পানি, কোক, ফান্টা। যা, তোর খালাম্মাকে বল, আজ সকালে রুটি খাব না আমি, পরোটা খাব। মুচমুচে পরোটা বানাতে বল, সঙ্গে একটা ফুলো ফুলো করে ডিম ভাজা। যা যা...।'

ডাইনিং টেবিলে নাশতা করছিল সবাই। ফেরদৌসী বেগম একটা গরম পরোটা এনে ফায়াজের প্লেটে দিয়ে বললেন, 'বাজার থেকে একটু চাল এনে দিতে পারবি! ঘরে এক ফোঁটা চাল নেই।'

চমকে ওঠার মতো ভঙ্গি করলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। হাতের পরোটার টুকরোটা প্লেটে রেখে বললেন, 'ও চাল কিনতে যাবে কেন বাজারে! ও কি বাজারে গেছে কখনো?'

'যায় নাই, যাবে।' ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'মাঝে মাঝে বাজারে যাওয়া ভালো। দুনিয়ার হাল-হকিকত বোঝা যায়।'

'কিন্তু ফায়াজ চাল-টাল কিছু চেনে না। বাজারে আজকাল কত রকমের চাল। অধিকাংশই ভেজাল।' প্লেট থেকে পরোটার টুকরোটা আবার হাতে নিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'আমি বাজারে যাচ্ছি।'

'আপনি না অসুস্থ, ডাক্তার আপনাকে তিন দিন রেস্ট নিতে বলেছেন!'

'ডাক্তাররা ওরকম বলেই। আমি অসুস্থ, এটা ঠিক আছে। তার জন্য তিন দিন বিছানায় মড়া মানুষের মতো শুয়ে থাকতে হবে, এটা মানতে পারছি না।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী আড়চোখে দিনার দিকে তাকালেন। দিনা পরোটা খাওয়াতে ব্যস্ত। তিনি তার দিকে গলাটা বাড়িয়ে বললেন, 'অবশ্য বাসার ভেতর শান্ত রাখাটা খুব প্রয়োজন। কেন যেন কোনোরকম শব্দই সহ্য হচ্ছে না। সবচেয়ে অসহ্য লাগছে ওই খায়ের পাটোয়ারী বাড়ি করার শব্দ।'

ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। সঙ্গে সঙ্গে ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'খাওয়া তো শেষ করলেন না আপনি, কোথায় যাচ্ছেন হঠাৎ?'

'বাজারে যাব, চাল আনতে হবে না!'

'আপনার না গেলে হয় না! আজ ফায়াজ যাক, ওকে বাজারে যাওয়ার অভ্যাস করান।'

'যাবে। লেখাপড়া শেষ করুক, নিজের একটা সংসার হোক, তখন এটা-ওটা আনতে এমনিই ঘনঘন বাজারে যাবে।'

রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই বাজারের ব্যাগটা হাতে নিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তারপর বেডরুমে গিয়ে গায়ের জামাটা চেঞ্জ করে রওনা দিলেন বাজারের দিকে।

বেলালের দোকানের সামনে গিয়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'বাবা বেলাল, একটা সমস্যা হয়ে গেল যে!'

কিছুটা উদ্বিগ্ন স্বরে বেলাল বলল, 'কীসের সমস্যা আংকেল?'

বেলালের দোকানটা ভালো করে আরেকবার দেখে নিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তোমার দোকানে তো চাউল নেই।'

'আমার দোকানে নাই তো কী হয়েছে! আপনার চাউল লাগব তো, কোনার ওই দোকান থেকে আমি এনে দিচ্ছি।' দোকান থেকে বের হতে হতে বেলাল বলল, 'কত কেজি লাগব আংকেল?'

দোকান থেকে বের হতেই বেলালের একটা হাত চেপে ধরলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'আমি তো দশ কেজি করে চাউল নেই, তুমি — ।'

মাখরাজ মুৎসুদ্ধীকে শেষ করতে দিল না বেলাল, 'আমি আনব নয় কেজি, তাই তো?'

খিক করে হেসে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'না, এক কেজি আলু-বেগুনে এক শ' গ্রাম কম নেওয়ার মতো দশ কেজি চাউলে এক কেজি কম আনতে হবে না তোমার। চাউল তুমি দশ কেজিই আনবে। কারণ তোমার আন্টির একটা প্লাস্টিকের পাত্র আছে। ওটাতে দশ কেজি চাউল সমান সমান হয়। অনেক দিন ধরে নিচ্ছি তো, হঠাৎ করে এক কেজি কম নিলে টের পাবে সে। তোমাকে অন্য একটা কাজ করতে হবে।'

বেলাল খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কী কাজ?'

'তুমি দুই ধরনের চাউল কিনবে। সাত কেজি, না না ছয় কেজি কিনবে মিনিকেট, আর বাকি চার কেজি কিনবে নাজিরশাইল।'

'মিনিকেট তো একচল্লিশ টাকা কেজি, নাজিরশাইল হলো ছয়চল্লিশ টাকা।'

'আমি সাধারণত নাজিরশাইলই কিনি, ছয়চল্লিশ টাকা করেই। এই দুই ধরনের চাউল কেনার পর তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বেলাল।'

'কী কাজ আংকেল?'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী আশপাশ তাকালেন। কেউ নেই। খুক করে কেশে তিনি বেলালের হাতটা আরো একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'ওই ছয় কেজি আর চার কেজি চাল ভালো করে একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাকেটে ভরবে।'

শব্দ করে হেসে উঠতে নিয়ে থেমে গেল বেলাল। মুখটা তবু হাসি হাসি করেই বলল, 'আন্টি টের পাবে না তো!'

'টের পেলে বলব বাজারে আজ কোনো ভালো চাল নেই, এটাই আছে।'

বেলাল কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল, 'আংকেল, একটা কথা বলি?'

হাত ছেড়ে বেলালের কাঁধে রেখে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'আমি জানি তুমি কী বলবে। কয়দিন হলো রাতে আমার ঘুম হয় না, দিনের বেলাতেও অস্বস্তিতে থাকি। বুকের ভেতর, মাথার ভেতর, পেটের ভেতর, শরীরের সর্বত্র কতগুলো শব্দ এসে ধাক্কা দেয়—রডের শব্দ, সিমেন্টের শব্দ, ইটের শব্দ। ওই খায়ের পাটোয়ারীর সঙ্গে আমি হেরে যেতে চাই না বেলাল। আমাকেও একটা বাড়ি করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে।'

সন্ধ্যায় ডাইনিং টেবিলের পাশের শোকেসে চোখ পড়ার পরপরই চিন্তাটা মাথায় আসে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। সুমী ওদের বাড়ি থেকে দেশি মুরগির যে ডিমগুলো এনেছে, সেদিন ওই শোকেসে রেখেছিল ওগুলো, এখনো ওখানেই আছে। তার মানে ওই প্যাকেট থেকে একটা ডিমও বের করা হয়নি, খাওয়ার কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এমনও হতে পারে ফ্রিজে ফার্মের মুরগির ডিম থাকে বলে এগুলোর কথা কারো মনেই নেই।

উনিশটা ডিম আছে সেখানে। অন্তত ছয়টা ডিম সরাতে হবে সেখান থেকে। সবাই ঘুমানোর পর বিছানায় উঠে বসলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ফেরদৌসী বেগম গুটিসুটি হয়ে ঘুমাচ্ছেন। কোনো শব্দ নেই, কোনো নড়চড়ও নেই।

বিছানা থেকে নামার আগে বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা হাতে নিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কারণ যে কোনো সময় মোবাইলটা বেজে উঠতে পারে। ইদানীং রাত দুটো থেকে তিনটার মধ্যে মোবাইলটা বেজে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। মাস তিনেক আগে একবার বেজে ওঠে। মোবাইল বাজছে। মাখরাজ মুৎসুদ্দীর মনে হচ্ছিল — স্বপ্ন দেখছেন তিনি, স্বপ্নের ভেতর কিছু একটা বাজছে, তিনি শুনতে পাচ্ছেন সেটা। অনেকক্ষণ শোনার পর হঠাৎ ধাক্কা অনুভব করেন তিনি। একটু পর টের পান, গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কাচ্ছেন ফেরদৌসী বেগম। ঘুম ভাঙা চমকানো গলায় বলেন, 'কী...কী।' ধাক্কা থামান ফেরদৌসী বেগম, 'ফোন বাজে তো আপনার।'

বালিশের পাশ থেকে ফোনটা নিয়ে দ্রুত রিসিভ করেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তিনি কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে লম্বা একটা সালাম দেন একজন, 'আ-স-সা-লা-মু আ-লা-ই-কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'

'ওলাইকমুওয়াস সালাম।' বলেই বিছানায় ঝট করে উঠে বসেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

'আল্লার দিদার লাভে ধ্যান করছিলাম আমি। হঠাৎ কুদরতি দয়ায় আপনার চেহারাটা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। আমি এও দেখতে

পেলাম, আমার একতলা টিনশেড বাসার পাশে যে খালি জায়গাটুকু আছে, সেটা খুব পবিত্রময় একটা জায়গা। কোনো একদিন কোনো মহান ওলি সেখানে বসে ধ্যান করতেন। সেটা এক শ' বছর আগে হতে পারে, আবার হাজার বছর আগে হতে পারে। তার ধ্যানের ফলে বড়ই পুণ্যময় হয়ে গেছে জায়গাটা। ফলে আপনার জন্য মস্ত বড় একটা সুখবর আছে।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী অস্ফুট স্বরে বলেন, 'কী?'

'ধ্যান করতে করতেই সেই সুখবরটা জেনেছি আমি। একজন পুণ্যবান মানুষ হিসেবে আপনাকে সেই খবরটা জানানো দরকার আমার। বলতে পারেন আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে আপনাকে সেই খবরটা জানানোর।' ওপাশের মানুষটি গম্ভীর গলায় বললেন, 'সুখবরটা কি শুনতে চান আপনি?'

কাঁপা কাঁপা গলায় মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'জি।'

'খবরটা খুবই গোপনীয়। শুধু আপনি জানবেন, আর কেউ জানবে না।'

'না, জানবে না।'

'ব্যাংকে আপনার যে পরিমাণ টাকা আছে, তার একান্ন ভাগ টাকা তুলে ফেলবেন আপনি। একান্ন ভাগই তুলে ফেলতে হবে, তার কম বা বেশি হলে চলবে না।' লোকটি খুক করে একটু কেশে বললেন, 'একান্ন ভাগ বুঝতে পারছেন তো আপনি? ব্যাংকে এক শ' টাকা থাকলে একান্ন টাকা, এক লাখ টাকা থাকলে একান্ন হাজার টাকা, এক কোটি টাকা থাকলে একান্ন লাখ টাকা। বোঝাতে পারলাম আমি?'

'জি, বুঝেছি।'

'আপনার কত টাকা আছে সেটা তো আমাকে জানানো হয়নি। যা-ই থাকুক তার একান্ন ভাগ টাকা তুলে প্রথমেই একটা মাটির পাতিলে ভরে ফেলবেন। বাড়িতে মাটির পাতিল আছে তো?'

'জি, আছে।'

'তারপর বাজার থেকে কেনা নতুন লাল শালু কাপড় দিয়ে পাতিলের মুখটা বেঁধে ফেলবেন। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন?'

'জি, পারছি।'

'পরশু দিন অমাবস্যা। মাঝরাতের পর ওই পাতিলটা আপনার বাসার ওই ফাঁকা জায়গায় পুঁতে রাখবেন। এই কাজটা করার সময় পেছন থেকে কেউ আপনাকে ডাক দিতে পারে। ওটা শয়তানের ডাক। ওই ডাককে অগ্রাহ্য করে পাতিল পুঁতে ফেলবেন মাটিতে। আপনার কাজ শেষ। ঘরে এসে জায়নামাজে বসে আল্লাকে ডাকতে থাকবেন। তারপর ফজরের

আজানের পরপরই পাতিলটা তুলে আনবেন সেখান থেকে। আপনার জন্য সুখবরটা হলো — পাতিলে রাখা আপনার টাকা ডাবল হয়ে যাবে।'

'তাই নাকি!'

'এটা তো আমার কথা না জনাব। ধ্যান করতে করতে কথাটা জেনেছি আমি, এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আপনার কথা শেষ!'

'জি, শেষ।'

'এত সুন্দর একটা খবর জানালেন আপনি! টাকা ডাবল হয়ে যাবে, এত টাকা দিয়ে আমি করব কী? আপনি বরং সেদিন সকালে চলে আসুন আমার বাসায়, কিছু টাকা আপনাকে দিয়ে দেব।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন!'

'আমি আপনার দুলাভাই নাকি যে আপনার সঙ্গে মশকরা করব। হ্যাঁ, আসার সময় দুই গালে ভালো করে সরিষার তেল মাখিয়ে আসবেন। প্লাস্টিকের একটা স্যান্ডেল আছে আমার। তা দিয়ে ঘষে ঘষে ওই গালের তেলগুলো তুলে দেব আমি। চিটিংবাজ, তোর চেয়ে বড় চিটিংবাজ আমি। হারামজাদা, বজ্জাত।'

তার মাস দেড়েক পর আবার ফোন বেজে ওঠে, মাঝরাতের পরেই। ফোন রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে হাসতে হাসতে একটা মেয়ে বলল, 'কনগ্রাচুলেশন স্যার। লটারির মাধ্যমে আপনার মোবাইল নাম্বারটা সিলেক্ট করেছি আমরা। আমাদের পক্ষ থেকে আপনি পাবেন দশ হাজার ডলার। তার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে স্যার।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'কী কাজ?'

'একটা ব্যাংক একাউন্টের নাম্বার মেসেজ করে পাঠাব আপনার মোবাইলে। আপনার নামটা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য মাত্র এক হাজার ডলার পাঠাতে হবে সেই অ্যাকাউন্টে।'

'মাত্র এক হাজার ডলার!'

'জি, এক হাজার ডলার।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী শান্ত গলায় বললেন, 'মারে, এত রাতে তোমার আর কোনো কাজ নাই? কোনো কাজ না থাকলে তোমার বাসার সামনে যে রাস্তা আছে, সেখানে গিয়ে গলা ফাটিয়ে গান গাও আর হাত-পা ছুড়ে নাচতে থাকো। তারপর সকালে একটা ভাঙা থালা নিয়ে বসে পড়ো ওই রাস্তাতেই, টাকার আর অভাব হবে না।'

পনের-বিশ দিন আগে আবার একটা ফোন আসে। রিসিভ করেই মাখরাজ মুৎসুদ্দী বলেন, 'হারামজাদার হারামজাদা, এত রাতে তোর কোনো কাজ নেই। কান বরাবর এমন একটা থাপ্পড় মারব তাল হারিয়ে বউরে মা বলে ডাকবি।'

কথাগুলো মনে পড়াতে হেসে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। মোবাইলটার সুইচ অফ করে দিয়ে রেখে দিলেন আবার আগের জায়গায়। বিছানা থেকে নেমে যেই না উঠে দাঁড়ালেন, চমকে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। চাপানো নেই রুমের দরজা, কে যেন সরে গেল দরজার সামনে থেকে। এত দ্রুত সরে গেল, বুঝতে পারলেন না কে সরে গেল।

মেরুদণ্ড বরাবর ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। বাসায় কি চোর ঢুকেছে! অসম্ভব কিছু না। আজকাল অনেকের বাসাতেই চোর ঢুকছে। চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু।

বাসায় চোর ঢুকলে কেমন লাগে—জানা ছিল না এত দিন। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটা এতই জটিল যে, বাসার ভেতর একটা চোর ঢুকেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কী করা উচিত, মাথায় আসছে না তা। কেমন যেন স্থবির হয়ে গেছে সব কিছু, মাথার ভেতরটাও স্থির হয়ে গেছে একদম।

স্ত্রীকে ডাকবেন কি না একটু ভাবলেন মুৎসুদ্দী। না, ডাকা ঠিক হবে না। তাতে শব্দ হবে, চোর পালিয়ে যাবে। চোরটাকে ধরা প্রয়োজন, চেনা দরকার লোকটা কে?

মাখরাজ মুৎসুদ্দীর এই মুহূর্তে মনে হলো, শোয়ার ঘরে প্রত্যেকের একটা বাঁশের লাঠি কিংবা হকিস্টিক থাকা দরকার। সঙ্গে বড় একটা ছুরি রাখলে আরো ভালো হবে। ধরা যাক, বাসার ভেতর ঢোকা এই চোরটাকে সরাসরি ধরতে যাবেন তিনি, কিন্তু চোরটা তো পালিয়ে যাওয়ার জন্য আঘাত করতে পারে। সেই আঘাতটা ঠেকানোর জন্যই লাঠি দরকার। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, কাল-পরশুর মধ্যে একটা লাঠি এনে ঘরে রাখবেন তিনি।

চোরটা বাসার ভেতর হাঁটাচলা করছে, অন্ধকারে এই রুমে থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে তা। সম্ভবত ঘরের দামি জিনিসগুলো একটা একটা করে নিয়ে জড়ো করছে সে এক জায়গায়, তারপর কিছু দিয়ে বেঁধে বাসার বাইরে নিয়ে যাবে চুপিচুপি।

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। বাড়ির কাজে হাত দেবেন বলে এত কিছু করছেন তিনি, ঘরের দামি জিনিসগুলো চুরি হয়ে গেলে এত কিছু করার তো তাহলে কোনো মানে হয় না!

লাফাতে শুরু করেছে বুকের ভেতরটা। মনটাও খারাপ হয়ে গেল অনেক। দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কাছে গিয়ে আড়াল থেকেই দেখার চেষ্টা করলেন সব কিছু। কিছুক্ষণ কিছু দেখা গেল না। চোরটা সম্ভবত রান্নাঘরে ঢুকেছে। সব কিছু বেছে বেছে নিয়ে বের হয়ে আসবে তারপর।

রুমের বাইরে পা রাখতে নিয়েই থেমে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ভয় করছে বেশ। বয়স হয়েছে, একটা কিছু হয়ে গেলে সমস্যা হবে খুব। ফায়াজকে যদি কোনোভাবে জাগিয়ে তোলা যেত! আচ্ছা, ওর মোবাইলে একটা ফোন করলে কেমন হয়? সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলেন ভাবনাটা। নিস্তব্ধ রাত, মোবাইল বেজে উঠলে শব্দ বেশ তীক্ষ্ণ হবে। শুনে চোরটা পালিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

চোরটাকে দেখা গেল আবার। ড্রইংরুমে ছিল সে এতক্ষণ। হেঁটে আসছে ওখান থেকে। আরো একটু আড়াল হলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। চোরটা এদিকেই এগিয়ে আসছে। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে রুমে ঢুকল তার। পাশে যে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, খেয়ালই করল না সে তা। সোজা হেঁটে খাটের ওপাশে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন তিনি। এ তিনি কাকে দেখছেন! চোখ কচলিয়ে ভালো করে তাকালেন তিনি! জানালার ওপরের দিকটা খোলা, পাশের বাসায় জ্বালিয়ে রাখা লাইটের আলোতে স্পষ্ট চিনতে পারলেন তিনি সুমীকে। তার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে, সে শুধু হাঁটছে না, ধ্যানও করছে।

হেসে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বুকের ভেতর থেকে গরম একটা বাতাস বের হয়ে গেল তার। সুমী যেভাবে হাঁটছে, এটাকে বলে স্লিপ ওয়াক, ঘুমের মাঝে হাঁটা। অনেকেই ঘুমের মাঝে এভাবে হাঁটে।

নাহ্, আজ আর ডিম সরাতে ইচ্ছে করছে না। ঘুমও আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না। জানালার কাছে গিয়ে নিচের দিকটা খুলে দিলেন তিনি। খায়ের পাটোয়ারীর প্লটে লাইট জ্বলছে। রড-সিমেন্ট পাহারা দেওয়ার জন্য এক লোকটা রাখা হয়েছে। লাঠি হাতে একটা টুলের উপর বসে আছে সে। ঘুমে একটু পর পর সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে লোকটা। চারদিক কী শান্ত আর নিঃশব্দ। কিন্তু বুকের ভেতরটা অশান্ত হয়ে উঠেছে তার। দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে জানালা বন্ধ করতেই তিনি প্রচণ্ড চমকে উঠলেন। সুমী তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু চোখ দুটো তার বন্ধ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে সে, গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে।

নাশতার টেবিলে বসে সকালে পত্রিকা পড়ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। পরপর দুটো খবর পড়ার পর তার মনে হলো — এ খবর দুটো তিনি জানেন, খুব চেনা চেনা লাগছে খবর দুটো। পত্রিকা থেকে চোখ সরিয়ে সামনের দেয়ালের দিকে তাকালেন। মনে করার চেষ্টা করলেন খবর দুটো তিনি কীভাবে জানেন, চেনা চেনা লাগছে কেন!।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর যখন মনে করতে পারলেন না, তৃতীয় খবরটা পড়া শুরু করলেন তিনি তখন। দুই প্যারা পড়েছেন, ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল ব্যাপারটা। খবর দুটো তিনি কাল রাতে টেলিভিশনে দেখেছেন এবং শুনেছেন। টিভিতে একটু সংক্ষিপ্ত ছিল, পেপারে লেখা আছে বিস্তৃত করে। তবে আসল ঘটনা একই।

তৃতীয় খবরটা আর শেষ করলেন না মাখরাজ মুৎসুদ্দী। পেপারটা ভাঁজ করে সামনে রাখলেন। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, খুব ভালো বুদ্ধি। মনটা খুশিতে ভরে উঠল তার। কিন্তু তিনি হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে আরো একটু ভাবলেন। না, মাথায় যে বুদ্ধিটা এসেছে তা খুব ভালো বুদ্ধি এবং গঠনমূলক বুদ্ধি। বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে হবে।

দিনা ওর রুমে বসে আছে। মাখরাজ মুৎসুদ্দী রুমের দিকে তাকালেন, 'দিনা, ব্যস্ত নাকি তুই?'

'খুব বেশি না।' ঘরের ভেতর থেকেই উত্তর দিল দিনা, 'কিছু বলবে?'

'এদিকে আয় তো একটু, নাকি!'

'জাস্ট দু' মিনিট, বাবা। বিছানার চাদরটা ঠিক করে আসছি।' দিনা কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'সুমী, ঝাড়ুটা নিয়ে আয় তো।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী দৈনিক পত্রিকাটা হাতে নিলেন আবার। পড়তে শুরু করলেন না তিনি, দেখতে লাগলেন উল্টেপাল্টে। তাতেই চোখে যে খবরগুলো পড়ল, অধিকাংশ চেনা মনে হলো তার।

দিনা এসে সামনের চেয়ারে বসল। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। পত্রিকা হাতে নিয়ে দিনা বলল, 'এটা

দিয়ে আমি কী করব? তুমি তো জানো আমি পত্রিকা পড়ি না। বাসায় পত্রিকা রাখা হয় তোমার জন্য আর ভাইয়ার জন্য। মাকেও তো পত্রিকা হাতে নিতে দেখি না কখনো।'

'তোকে পত্রিকা পড়তে বলছি না আমি। শুধু হেডিংগুলো দেখতে বলছি তোকে। সবগুলো না, কয়েকটা হেডিং পড়ে আমার দিকে তাকা, নাকি!'

দ্রুত কতগুলো হেডিং পড়ে বাবার দিকে তাকাল দিনা। মাখরাজ মুৎসুদ্দী দিনার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'কী বুঝলি?'

দিনা অবাক স্বরে বলল, 'কী বুঝব!'

'হেডিংগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে না তোর, নাকি?'

'চেনাচেনা মনে হবে না কেন! প্রায় সবগুলো খবরই তো কাল রাতে টিভিতে দেখিয়েছে।' পত্রিকাটা আবার দেখতে লাগল দিনা, 'এই যে, এই খবরটা তো সব চ্যানেলেই দেখিয়েছে।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী রান্নাঘরের দিকে তাকালেন, 'সুমী, আমার রুম থেকে একটা কলম নিয়ে আয় তো।' সুমী কলম নিয়ে আসতেই সেটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি দিনার দিকে। কলমটা হাতে নিয়ে দিনা বলল, 'এটা দিয়ে আমি কী করব?'

'পত্রিকার হেডিংগুলো দেখে কোন খবরগুলো তোর চেনা চেনা মনে হয়, টিক চিহ্ন দে সেগুলোতে।'

'টিক চিহ্ন দিতে হবে না বাবা। বললাম না, প্রায় সব খবরই কাল টিভিতে দেখা হয়েছে।'

দিনার হাত থেকে পত্রিকা আর কলমটা হাতে নিয়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'ফায়াজ কোথায়?'

'ভাইয়া তো ওর রুমে।'

'পাঠিয়ে দে একটু।'

ফায়াজ এসে দিনার জায়গাতে বসতেই মাখরাজ মুৎসুদ্দী পত্রিকা আর কলমটা বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে। তারপর দিনাকে যা বলেছিলেন, তা বললেন। ফায়াজ একপলক সবগুলো হেডিং পড়ে প্রায় সবগুলোতে টিক চিহ্ন দিয়ে বলল, 'টিভি দেখলে আর পত্রিকা পড়তে হয় না এখন।'

'তোর সঙ্গে আমি এক শ' পার্শেন্ট একমত।' দু'হাতের তালু একসঙ্গে ঘষতে ঘষতে মাখরাজ মুৎসুদ্দী চেহারাটা হাসি হাসি করে বললেন, 'বাইরে যাবি না আজ?'

'ভার্সিটি আজ বন্ধ তো। দেখি, বিকেলে একটু যেতে পারি।' ফায়াজ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেন, কিছু করতে হবে তোমার?'

'তোর একটা বন্ধু আছে না, আর্কিটেক্টে পড়ে?'

'হ্যাঁ, দীপক।'

'ওদের বাসায় একদিন নিয়ে যাস তো আমাকে।'

'কোনো দরকার আছে বাবা?'

'আমাদের এই আড়াই কাঠা জায়গায় বাড়ি করতে কত টাকা-পয়সা খরচ হবে, তার একটা হিসাব নিতাম আর কি।'

'এটার জন্য তুমি ওর বাসায় যাবে কেন! ওকেই আমাদের বাসায় নিয়ে আসব।' ফায়াজ ডাইনিং টেবিলের চেয়ারটা ঠিক করে রেখে বলল, 'কবে নিয়ে আসব বলো?'

বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। বাসায় আসা মানেই চা-নাশতা। কিছুটা লাফ দিয়ে ব্যস্ততার ভঙ্গিতে বললেন, 'না না, আপাতত দরকার নেই। যখন দরকার হবে, বলব তোকে।'

দ্রুত কাপড় বদলিয়ে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বাসায় পত্রিকা দেয় যে হকারটা, বারোটার দিকে হকার সমিতির অফিসে থাকে সে। তার সঙ্গে দেখা করতে হবে আজ। দুপুরের আগেই আবার ফেরত আসতে হবে বাসায়। বিকেলে জরুরি একটা কাজ আছে।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হলো। মা ঘোরালেন সেদিকে। বেলা এগারোটা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই মন কিছুটা খারাপ হয়ে গেল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। সেদিনের পর ঘড়ির ব্যাটারি আর খুলে রাখার সুযোগ হয়নি তার। একটা বাসায় চার চারটা ঘড়ি—দুটো টেবিল ঘড়ি, দুটো দেয়াল ঘড়ি। কোনো মানে হয়! কয়দিন পরপর ব্যাটারি বদলাতে হয়। কী নিদারুণ অপচয়। একটা বাসায় একটা ঘড়ি থাকলেই হয়। অনেকের বাসায় একটাও তো নেই। না, এর একটা পার্মানেন্ট বিহিত করা দরকার খুব তাড়াতাড়ি। মনে মনে ভাবলেন তিনি।

বাসা থেকে বের হওয়ার আগে একবার বাথরুমে যাওয়ার অভ্যাস মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। বাথরুমে ঢুকলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল তার। তার বড় মেয়ের গলা শোনা যাচ্ছে, সঙ্গে তার দুই ছেলের। পশ্চিম ধানমন্ডিতে থাকে ওরা, মাসে অন্তত দুবার এই মিরপুরে বেড়াতে আসে। রাতে অবশ্য থাকে না, তবে সারা দিন দুই নাতি যা করে, অন্য কারো নাতি এ রকম করে কি না, জানা নেই তার। খাওয়ার ব্যাপারে একেকজন সর্বভুক। বড় নাতিটার বয়স ছয়

বছর। সারা দিন কমপক্ষে দুটো সিদ্ধ ডিম, দু' গ্লাস দুধ, চিকেন ফ্রাই তিন থেকে চার পিস, আইসক্রিম, চিজ মেশানো বিস্কিট, দশ-বারোটা চার-পাঁচ রকমের চকোলেট, চিপস দু' প্যাকেট, ভাত খেতে বসলে কমপক্ষে দু' টুকরো মাছ, মাংস হলে ছয়-সাত টুকরো, পেটে যায় তার। ছোটটার বয়স সাড়ে চার বছর, বড় ভাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাছাকাছি খাবার-দাবার পেটে ঢুকায় সে। বাসার মানুষগুলোও এমন না, তাদের খাওয়া দেখে এমন মজা পায়, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে অনেকে। তাদের হাসি দেখে মনে হয়, জগতে এর চেয়ে মজার আর কোনো ব্যাপার নেই। রাবিশ!

মাখরাজ মুৎসুদ্দী বাথরুমে ঢুকলেন আবার। বেসিনের ট্যাপ ছেড়ে, তার নিচে হাত রেখে ভাবলেন কিছুক্ষণ। মাথায় কিছু আসছে না, বরং আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে সেটা। ঘাড়টাও ব্যথা শুরু করেছে হঠাৎ।

ভেজা হাতটা ঘাড়ে রাখলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। একটু আরাম লাগল, কিন্তু মন শান্ত হলো না। চোখ দুটোর ওপরও কেমন যেন চাপ বাড়ছে, মনে হচ্ছে ঠিকরে বের হয়ে যাবে যে কোনো সময়। দ্রুত পানির ঝাপটা দিলেন তিনি চোখে। না, মাথায় কোনো উপায় আসছে না এখনো।

বেসিনে হাত রেখে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। রাগে হঠাৎ ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে সব কিছু। মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন তিনি। চোখ দুটো বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন, খোলা ট্যাপের নিচে হাত, মন বুদ্ধি বের করার চেষ্টারত।

বুদ্ধিটা মাথায় এসে যায় মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম থেকে বের হয়ে দৌড়ে যান ড্রইংরুমের দিকে, যেন নাতিদের শব্দ পেয়ে আনন্দে উতলা হয়ে গেছেন তিনি।

দু'হাত দিয়ে দুই নাতিকে জড়িয়ে ধরে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'বাইরে যাচ্ছি আমি, একটু কাজ আছে, এখনই ফিরব। ওদেরকেও নিয়ে যাই।'

বাসা থেকে কিছু দূর এসে মাখরাজ মুৎসুদ্দী তার দুই নাতিকে বললেন, 'একটা জিনিস খাওয়াব এখন তোমাদের। কিন্তু কী খাইয়েছি বাসায় গিয়ে তা বলা যাবে না। রাজি?'

খাওয়ার কথা শুনে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল দুজনই। তারপর দুজন একসঙ্গে বলল, 'না, বলব না।'

দুই নাতির মাথায় হাত রাখলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'তোমরা তো চা খাও, কী খাও না?'

'জি, খাই।' দুজন প্রায় একসঙ্গে বলল।

'কিন্তু চায়ে কি কখনো পাউরুটি চুবিয়ে খেয়েছ?'

দুজন আবার একসঙ্গে বলল, 'না।'

'আজ তোমাদের আমি চা দিয়ে পাউরুটি খাওয়াব। চায়ে চুবিয়ে পাউরুটি যে কী মজার!' দুই নাতির দু'হাত ধরে বাস স্ট্যান্ডের কাছে চলে এলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ছোট্ট টং ঘরের একটা চায়ের দোকানের সামনের কাঠের বেঞ্চে বসালেন দুজনকে। তারপর অতি দ্রুত দুজনকে দু'কাপ করে চা আর গোল গোল চারটা করে পাউরুটি খাওয়ালেন। আরো খাবে কি না জিজ্ঞেস করতেই দুজন পেটে হাত দিয়ে কাতর গলায় বলল, 'অসম্ভব। বাসায় গিয়েও কিছু খেতে পারব না। পেট একেবারে ভরে গেছে। আর একটু খেলেই ফেটে যাবে একেবারে।'

মুখটা হাসি হাসি করে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দু' দু' চার কাপ চা, পাঁচ টাকা করে হলে বিশ টাকা; চার চার আটটা পাউরুটি, সাত টাকা করে হলে ছাপ্পান্ন টাকা; মোট সাতাত্তর টাকা। সারা দিনে সাত-আট শ' টাকার খাবার শেষ করার চেয়ে অনেক কম।

বুকের ভেতরটা পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। চা-পাউরুটির দাম মিটিয়ে বাসার দিকে যেতে লাগলেন দুই নাতির হাত ধরে। নাচার মতো করে হাঁটছেন, ছোট্ট ছোট্ট শিষ বাজিয়ে গুন গুন করে কী একটা গানও গাচ্ছেন তিনি!

না, হকারের কাছে আজ আর যাওয়া হলো না। বাসায় পত্রিকা দিতে না করার কথা আজ বলা হলো না তাকে। কাল-পরশু বলতে হবে তাকে, অবশ্যই বলতে হবে। টিভি থাকতে বাসায় আবার পত্রিকা নেওয়াটা ভীষণ অপচয়ের পর্যায়ে পড়ে!

খুব আনন্দ নিয়ে আজ ঘুম থেকে উঠেছেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। রাতে যে ভালো ঘুম হয়েছে, সে জন্য না। সুন্দর যে একটা স্বপ্ন দেখেছেন, সে জন্যও না। ফায়াজ আর দিনাকে প্রতি মাসে লেখাপড়া বাবদ যে খরচ দেন, তা থেকে পাঁচ শ' পাঁচ শ' করে এক হাজার টাকা কৌশলে যে কম দিতে পেরেছেন কাল রাতে, তার জন্যও না। চিকিৎসার জন্য গ্রাম থেকে দুজন আত্মীয় আসার কথা ছিল রাতের ট্রেনে, তারা আসেনি, সেই আনন্দেও না। পাশের বাসায় দাওয়াত ছিল কাল, রাতে রান্না করতে হয়নি তাই, চাল-তরকারি বেঁচে যাওয়াতেও না। ফ্রিজ থেকে পুরো একটা ইলিশ মাছ সরাতে পেরেছেন মাঝরাতে, সেটা বাজারে বিক্রি করতে পারলে বেশ কয়েকটা টাকা জমবে বাড়ি করার কাজে, সেটা হিসাব করেও না। খুব আনন্দ হওয়ার কারণ হচ্ছে—খায়ের পাটোয়ারীর বাড়ি করা দেখে সেই যে বিভিন্ন কায়দায় টাকা জমানো শুরু করেছেন, তার আজ ছয় মাস শেষ হলো। এই ছয় মাসে কত টাকা জমাতে পেরেছেন, তার আজ হিসেব করবেন তিনি।

টাকা জমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই লম্বা একটা খাতা কিনেছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। প্রতিদিন টুকটুক করে যা জমিয়েছেন, তার সবটুকুই লিখে রেখেছেন খাতায়। তার ব্যক্তিগত পুরনো যে কাঠের আলমারি আছে, সেখানে রাখা আছে খাতাটা। তালা মারা থাকে সেটাতে, প্রয়োজনের সময় বের করে কাজ সারেন, ঢুকিয়ে তালা মেরে রাখেন আবার।

বিছানা গোছাচ্ছিল সুমী। বাথরুমের দিকে যেতে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ান মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ওর দিকে একটু এগিয়ে দু'হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বলেন, 'নাশতার খবর কি রে সুমী?'

'আমি তো এদিকে, খালাম্মা আছে রান্নাঘরে।'

'যা বল, আমি আজ পরোটা খাব। তিনটা পরোটা খাব। মুচমুচে করে ভাজতে বলবি। সঙ্গে সবজি আর ফুলা ফুলা করে একটা ডিম। খাওয়া শেষে ঘন দুধের এক কাপ চা।' চেহারাটা হাসি হাসি করে ফেলেছেন

মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'মাঝে মাঝে এ রকম আয়েশী করে খাবার খেতে হয়। দু'দিনের দুনিয়া, ভালো-মন্দ কিছু না খেতে পারলে মরার সময় আফসোস লাগবে। নাকি?'

'জি খালুজান।'

'বাসায় পায়েসের চাল আছে না?'

'আছে।'

'যা, একটু পায়েস রান্না করতে বল আমার জন্য। চিনি বেশি দেওয়ারও দরকার নেই, কম দেওয়ারও দরকার নেই। স্বাভাবিক দিলেই হবে, নাকি! এলাচ দু-একটা বেশি দিতে বলিস। আমার আবার এলাচের গন্ধ খুবই পছন্দ, নাকি!'

'বড় এলাচ না ছোট এলাচ, খালুজান?'

'ছোট এলাচই তো বোধহয় ভালো। বড় এলাচ যদি দেওয়া যায়, দিস দু-একটা।' দু'হাতের তালু আবার ঘষতে থাকেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'যা যা, তোর খালাম্মাকে তৈরি করতে বল খাবারগুলো, নাকি! বাথরুম থেকে বের হয়েই খেতে বসব আমি। তাড়াতাড়ি করতে হবে সব কিছু, জরুরি কিছু আছে আজ।' হাত ঘষতে ঘষতেই বাথরুমে ঢোকেন তিনি।

গুনগুন করে গান গেয়ে কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখেন বিছানার ওপর বসে আছেন ফেরদৌসী বেগম। দু'পা তুলে এমনভাবে বসে আছেন, যেন দীর্ঘমেয়াদি কথা বলবেন, কিংবা অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা করার পর কোনো কিছুর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

কিছুটা থমকে দাঁড়ালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বিশেষ ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকালেন তিনি। শঙ্কিত ভঙ্গিতে একটু এগিয়ে গেলেন সামনে, 'কী ব্যাপার, তোমার বসা দেখে তো মনে হচ্ছে কোনো দাবি আদায়ের লক্ষ্যে, সিদ্ধান্তে অটল থেকে, মৃত্যুর কামড় না আসা পর্যন্ত বসেই থাকবে এভাবে।'

'এভাবে বসাতে আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে?' গলার স্বর গম্ভীর করে বললেন ফেরদৌসী বেগম।

'না না, সমস্যা হবে কেন?' মোসাহেবি একটা হাসি দিয়ে স্ত্রীর মুখোমুখি বসলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'কঠিন কিছু বলার জন্য এসেছ নাকি?'

'গত কয়েক মাস ধরে খেয়াল করছি, বাজার থেকে আপনি যা কিনে আনছেন, তাতে কোনো বরকত হয় না। আগে একটা জিনিস আনলে কম মনে হতো না, এখন কম মনে হয়।'

'খারাপ লোকে ভরে গেছে দেশটা। মাপে নিশ্চয় কম দেয়, নাকি!'

'মাপে কম দিলে দু-একজন দেবে, সবাই কি দেবে!' ফেরদৌসী বেগম মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন, 'আপনি আলু দিনে আনেন, আলু কম মনে হয়। চাল কিনে আনেন, চাল কম মনে হয়। ভালো চালের মধ্যে আবার কম দামের চালও মেশানো থাকে। মাছ আনেন, মাছের কোনো আয় হয় না। আগে সব জিনিসের কেমন যেন বরকত হতো এখন হয় না।'

'তোমার কথা সত্য। সম্ভবত কেয়ামত এসে যাচ্ছে, নাকি! কেয়ামতের আগে সব জিনিসের বরকত কমে যাবে।'

'বরকত কমুক আর বাড়ুক, কাল থেকে আমি বাজারে যাব। জিনিসপত্র সব আমি কিনব। দেখি, মাপে কে কে কম দেয়। ধরতে পারলে ওই বাজারের ভেতরই জুতা পেটা করব।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী উত্তেজিত হতে নিতেই শান্ত হয়ে গেলেন। স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে বসলেন একটু। মোলায়েম গলায় বললেন, 'বাজারে যাওয়া কী তোমার ঠিক হবে ফেরদৌসী?'

'কেন!' কপাল কুঁচকে ফেললেন ফেরদৌসী বেগম, 'কেন ঠিক হবে না?'

'তোমাকে তো তেমন ভালো-দামি কাপড়-চোপড় কিনে দিতে পারি না। তুমি নিতেও চাও না।' শরমিন্দা একটা হাসি দেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'বছরের দু' ঈদে যা কেনো, তা তো সারা বছর পরলেই শেষ হয়ে যায়। দু-একটা যা থাকে, আলমারিতে তুলে রাখো তা। এখানে-ওখানে, কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বেড়াতে গেলে লাগে। বাজারে গেলে তো ঘরের কাপড় পরে যেতে পারবে না। ওই তুলে রাখা ভালো কাপড় পরে যেতে হবে। নাকি!'

'ওই তুলে রাখা কাপড় পরেই যাব। অসুবিধা কী!'

'অসুবিধা হচ্ছে, বাজারে যে নোংরা ময়লা-কাদা, মাছের বাজারে যেভাবে গন্ধওয়ালা পানি ছিটানো হয়, তোমার কাপড় তো প্রতিদিন ধুতে হবে।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী দু'হাত কচলাতে শুরু করলেন আবার, 'প্রতিদিন ধুলে কি সেই কাপড় ঠিক থাকবে? নষ্ট হয়ে যাবে না?'

'তার মানে কি — বাজারে যাব না আমি?'

'অবশ্যই যাবে। বাজারে যাওয়া তোমার সাংসারিক অধিকার। কিন্তু তুমি তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, কোরআনও পড়ো। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েদের বাজারে যাওয়া ঠিক?'

'কেন ঠিক না?'

'পরপুরুষের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি, চোখাচোখি, কেমন একটা বেদাত কাজ না?'

'বেদাত কাজ মানে কী?'

'বেদাত মানে ওই— ।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী আবার শরমিন্দা একটা হাসি দেন, 'তুমি হচ্ছ আমার বউ, কিন্তু তোমাকে দেখবে সারা বাজারের লোক, ব্যাপারটা কি সহনীয়?'

'অসহনীয়ের কী হলো! আমি কি মুখে রং-চং মেখে, হাত-পায়ে গয়নাগাটি ঝুলিয়ে, গায়ে আতর-সুবাস মেখে বাজারে যাব! আপনি তো জানেন, বাড়ির বাইরে বের হলে আমি বোরকা পরি।'

'তারপরও কথা থাকে। তুমি বলেছ, ইদানীং জিনিসপত্র কম মনে হচ্ছে তোমার। ব্যাপারটা আমি জানলাম। এরপর থেকে খেয়াল করব, ব্যাটারা সত্যি সত্যি মাপে কম দেয় কি না।' চোখ-মুখ শক্ত করেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'কম দিলে রক্ষা আছে, ঘাড় মটকে দেব না! যাও, এ নিয়ে তোমার বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে হবে না। আমি আছি না!'

স্বামীর দিকে সন্দেহজনক একটা দৃষ্টি দিয়ে রান্নাঘরে গেলেন ফেরদৌসী বেগম। সঙ্গে সঙ্গে কপাল চেপে ধরলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বউ কিছু টের পেয়ে গেল না তো! তাহলে তো সর্বনাশ!

চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন তিনি। মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। যে কোনো শুভ কাজে বাধা আসেই—কথাটা মনে হতেই মনটা শান্ত হতে শুরু করল তার। অনেকটা শান্ত হয়ে আসতেই ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসলেন। ফায়াজ আর দিনা ওদের রুমে। একা একাই দ্রুত নাশতা শেষ করে, দু'হাতের তালু ঘষতে ঘষতে, বেডরুমে ঢুকলেন তারপর।

ফেরদৌসী বেগম কাজ করছেন রান্নাঘরে। আলমারি খুলে খাতাটা বের করলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। প্রচণ্ড সাবধানতা অবলম্বন করে সেটা আর ড্রয়ার থেকে ক্যালকুলেটরটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন তিনি। দু'পাতা হিসাব করে যেই না তিন নম্বর পাতায় যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে টংটং করে কলিংবেল বেজে উঠল বাসার।

হিসাব বন্ধ করে বাথরুমের দরজার দিকে কান পাতলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দরজার দিকে কারো দৌড়ে যাওয়ার শব্দ পেলেন। কিন্তু কে দৌড়ে গেল বুঝতে পারলেন না তা। কান পেতে রইলেন তবুও। একটু পর

দিনার গলা শোনা গেল। চিৎকার করে কার কার যেন নাম উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বুঝে ফেললেন তিনি—দিনার বান্ধবীরা এসেছে, কমপক্ষে চার থেকে পাঁচজন। সারা দিন থাকবে, এটা-ওটা খাবে, ফ্যান ছেড়ে বাতাসে শরীর জুড়াবে, ফ্রিজের পানি নষ্ট করবে। অনেকগুলো টাকা নষ্ট হবে আজ। গত মাসে বিদ্যুৎ বিল বাড়িয়েছে সরকার। সেটা শুনে কান্না এসে গিয়ে ছিল তার। এ মাসেই এমনিতেই বিল তাই বেশি আসবে, তার ওপর আজ অতিরিক্ত ইউনিট খরচ হবে!

মাথাটা হঠাৎ ধরে গেল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। কপালের দু'পাশটাও চেপে আসছে। চোখ ফেটে যেতে চাচ্ছে কষ্টে। আলতো করে বাথরুম থেকে বের হয়ে স্ত্রীকে ডাকলেন। রান্নাঘর থেকে ফেরদৌসী বেগম আসতেই কিছুটা ব্যস্ততা নিয়ে বললেন, 'আমার এক বন্ধু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ল্যাবএইডে ভর্তি হয়েছে। অবস্থা ভালো না ওর। এই মাত্র মোবাইলে ওর ছেলে জানাল। এখনই যেতে হবে আমাকে।'

দ্রুত রেডি হলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। দিনার রুমে ওর বান্ধবীদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফেরদৌসী বেগমকে এক গ্লাস পানি আনতে বলে তিনি চলে গেলেন পেছনের বারান্দায়। সেখানে কারেন্টের মেইন সুইচটা আছে। টুক করে বন্ধ করে দিলেন সেটা। বাসার কারেন্টের ব্যাপারে তিনি ছাড়া কেউ কিছু জানে না, জানে না এই মেইন সুইচের ব্যাপারটাও। সারা দিন কারেন্ট না এলেও কেউ বুঝতে পারবে না কোথা থেকে কী হলো! কারেন্ট না থাকাতে দুটো কাজ হবে—এক. বিদ্যুৎ বিল উঠবে না। দুই. যা গরম পড়েছে, এই গরমে কারেন্টহীন বাসাতে বেশিক্ষণ দিনার বান্ধবীরাও থাকবে না। চেহারাটা আবার হাসি হাসি হয়ে উঠল তার, কিন্তু ঘাড়ের ব্যথাটা এখনো রয়ে গেছে।

বাসার বাইরে এসেই রাস্তার ওপাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলেন মাহবুবকে। হাত দিয়ে ইশারা করে কাছে ডাকলেন ওকে। আজ সারা দিন, বিশেষ করে দিনার বান্ধবীরা বাসা থেকে না যাওয়া পর্যন্ত বাইরে বাইরে কাটাবেন তিনি। এই সময় একজন মানুষের সঙ্গ খুব প্রয়োজন, একা একা আর কতক্ষণ কাটানো যায়। দুপুরে কিছু না কিছু খেতে হবে, চা-টাও খেতে হবে কয়েক কাপ, এটাও মাহবুবের ওপর দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে। ধনী মানুষের ছেলে, পকেটে সব সময় অনেক টাকা-পয়সা থাকে। সমস্যা হবে না তাই। ঘাড়ের ব্যথাটা এখনো আছে, বিরুলিয়া নদীর ধারে বসে ঘাড়টাও টিপিয়ে নেওয়া যাবে ওকে দিয়ে।

মাহবুব কাছে আসতেই ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। আলতো করে কাছে টেনে বললেন, 'কী মাহবুব, ইয়ং ম্যান, কেমন আছ? দিন-কাল কেমন যাচ্ছে? চলো, আজ সারা দিন বেড়াব। আর কেউ না, আমি আর তুমি।' মাহবুবের মুখের দিকে তাকালেন তিনি, 'কী, ভালো হবে না?'

যাকে বিয়ে করতে চায় সে, তার বাবা তার সঙ্গে সারা দিন বেড়াবে। সেই আনন্দে কান পর্যন্ত হেসে মাহবুব বলল, 'খুব ভালো হবে।'

'চলো, প্রথমেই কিছু খেয়ে নেই। কোক আর ভালো এক প্যাকেট বিস্কিট কিনি।' টাকা বের করার জন্য পকেটে হাত ঢোকালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কিন্তু টাকা বের করার আগেই মাহবুব দৌড়ে গেল সামনের দোকানে। কিছু বললেন না তিনি। পকেটে হাত ঢুকিয়েই হাসতে লাগলেন মন শান্ত হওয়া আনন্দে!

রাত আটটার দিকে বাসায় ফিরেই চমকে ওঠেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। সারা বাড়ি অন্ধকার, ডাইনিং টেবিলে কেবল একটা মোমবাতি জ্বলছে টিমটিম করে। মাথায় হাত দিয়ে তার পাশে বসে আছেন ফেরদৌসী বেগম। ফায়াজের ঘর থেকে চটচট শব্দ ভেসে আসছে। অন্ধকারে মশা মারার চেষ্টা করছে সে। দিনা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে মোবাইলে। কথা বলার চেয়ে হাসিটাই বেশি শোনা যাচ্ছে ওর।

বাইরের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সুমী। মাথায় হাত দিয়ে আগের মতোই বসে আছেন ফেরদৌসী বেগম। কোনো নড়চড় নেই, মূর্তির মতো স্থির। তাকে দেখেও একপলক তাকাননি।

সুমীর দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি। ইশারা করলেন স্ত্রীকে দেখিয়ে। সুমী আরো একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আপনে বাসা থাইক্যা বের হওয়ার পর থাইক্যা কারেন্ট নাই। মাথা গরম হইয়া গেছে খালাম্মার। এ পর্যন্ত তিনবার মাথায় পানি ঢালছি। ঠাণ্ডা হয় নাই এখনো।'

মোবাইলে কথা বন্ধ করে দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে এলো দিনা। বাবার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আশপাশে সব বাসায় কারেন্ট আছে, আমাদের বাসায় নাই। ব্যাপার কি বলো তো, বাবা?'

'ব্যাপার নিশ্চয় কিছু একটা আছে।'

'আমি সেই ব্যাপারটাই জানতে চাচ্ছি।'

'দেখি কোথায় কী হয়েছে।'

'তুমি বাসা থেকে বের হওয়ার আগে আগে কারেন্ট চলে গেল। দুপুর হওয়ার পরও যখন কারেন্ট এলো না, মা তখন পাশের বাসায় খোঁজ নিয়ে দেখল কারেন্ট আছে ওই বাসায়। তার মানে কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে আমাদের বাসায়।'

'এই সমস্যাটা কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি?'

'আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি বাবা।' ফায়াজ ওর রুম থেকে বের হয়ে বলল, 'সব জায়গায় ভালো করে দেখেছি, কিন্তু কোথাও কিছু খুঁজে পেলাম না।'

'সমস্যা খুঁজে বের করতে হলে তো সেই সমস্যা সম্বন্ধে সামান্য হলেও জ্ঞান থাকতে হবে। নাকি?' এক গ্লাস পানি দেওয়ার জন্য সুমীকে ইশারা করার পর বললেন, 'আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল পুথিগত বিদ্যা শেখায়, কিন্তু প্র্যাকটিকেল কিছু শেখায় না। প্র্যাকটিকেলের মধ্যে শেখায় কী, কেবল ছবি আঁকা। তাও ওয়ান টু থ্রিতে। ক্লাসে ফোর ফাইভে ওঠার পর পড়ার চাপে সেই আঁকাআঁকি বন্ধ হয়ে যায়। আরে বাবা, সবাই কি জয়নাল আবেদীন হবে নাকি! ওই আঁকাআঁকি শেখানো বাদ দিয়ে যদি কীভাবে ভালো করে বাজার করতে হয়, দেয়ালে কেমন করে পেরেক গাঁথতে হয়, লাইট নষ্ট হলে কীভাবে সেটা বদলাতে হয়, এ রকম সাংসারিক কাজগুলো শেখানো যেত তাহলে বাস্তব জীবনে অনেক উপকার হতো। তা না, আজেবাজে জিনিস শিখিয়ে বাল্যকালটা শেষ করে দেয়।'

'ঘরের ময়লা পরিষ্কার করার লাঠি দিয়ে আমি অবশ্য মেইন সুইচের কাছের তারগুলো নেড়েচেড়ে দেখেছি।' ঠোঁট ওল্টাল ফায়াজ, 'না, কোনো কাজ হয়নি।'

'চলো তো।' ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। মোমবাতিটা হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বাম হাত দিয়ে উঁচু করে কারেন্টের মেইন সুইচের কাছে ধরলেন সেটা। তারপর ডান হাত দিয়ে সকালে উঁচু করা সুইচের নবটা নামিয়ে দিলেন নিচে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল রুমের বাতিগুলো। বিজ্ঞের একটা হাসি দিয়ে যে-ই না তিনি হাতটা নামাচ্ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে পড়ে গেলেন পাশে। কপালটা গ্রিলে লেগে কেটে গেল গেল অনেকখানি। সবাই দৌড়ে এসেছে বারান্দায়। ফেরদৌসী বেগম চিৎকার করে বললেন, 'কী হয়েছে আপনার?'

কপাল চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। মেইন সুইচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা তার খুলে আছে সেখানে। সম্ভবত ফায়াজের লাঠির গুঁতোতে খুলে গেছে সেটা। খেয়াল না করাতে সেটাতে হাত লেগে শক খেয়েছেন তিনি।

কপাল দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। ফেরদৌসী বেগম তাকে চেপে ধরে বললেন, 'ফায়াজ, বড় রাস্তার মোড়ে হাসপাতালটা আছে না, ওখানে নিয়ে চল তোর বাবাকে, সম্ভবত কপালে সেলাই লাগবে।'

'না না, সেলাই লাগবে না।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন।

'সেলাই লাগুক অথবা না লাগুক, হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে। কোনো কথা শুনতে চাই না আপনার।' মাখরাজ মুৎসুদ্দীকে টেনে ধরে আগের চেয়ে শব্দ করে বললেন ফেরদৌসী বেগম।

'চারটা সেলাই লাগবে।' তুলো আর স্যাভলন দিয়ে যত্ন করে কপালটা মুছে ডাক্তার বললেন, 'এখনই করতে হবে সেলাইগুলো।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী ভাবলেশহীনভাবে সামনের দিকে তাকালেন। বাসার সবাই এসেছে হাসপাতালে, সুমীও। ডাক্তার সাহেব পাশে দাঁড়ানো নার্সকে বললেন, 'সিস্টার, চলুন ওনাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে এখনই, দেরি করা ঠিক হবে না।'

সবাই বাইরে গিয়ে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে লাগল। মাখরাজ মুৎসুদ্দীকে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলেন নার্স। পনের-বিশ মিনিট পর ডাক্তার সাহেব ওয়েটিং রুমে এসে বললেন, 'সব কাজ শেষ, মিনিট দশেক পর বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন ওনাকে। বেডে শুয়ে আছেন তিনি, আপনারা এখন ওনার কাছে যেতে পারেন।'

বেডের কাছে সবাই এসে দেখল, বেডে নেই মাখরাজ মুৎসুদ্দী। ভাবল, বাথরুমে গেছেন তিনি। কিন্তু দশ-বারো মিনিট পর্যন্ত যখন বন্ধই রইল বারুমের দরজা, তখন সেদিকে এগিয়ে গেলেন ফেরদৌসী বেগম। নক করলেন দরজায়, কেউ সাড়া দিল না। কয়েক সেকেন্ড পর আবার করলেন, এবারও না।

সবার দিকে একপলক তাকালেন ফেরদৌসী বেগম। সবার চোখে কৌতূহল। চোখ দুটো সরু করে, মাথাটা দরজার দিকে কাত করলেন তিনি এবার, 'ফায়াজের বাবা, ভেতরে আছেন নাকি?'

কোনো শব্দ এলো না বাথরুমের ভেতর থেকে।

আবার জিজ্ঞেস করলেন ফেরদৌসী বেগম। না, এবারও কোনো শব্দ এলো না।

ফেরদৌসী বেগম ফিরে তাকালেন আবার সবার দিকে। সবার চোখ থেকে কৌতূহল সরে গেছে, সেখানে এখন উদ্বিগ্নতা। বাথরুমের দরজার নবে হাত রাখলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড স্থির রেখে মোচড় দিলেন সেটা। দ্বিধা আর লাজুকতা নিয়ে উঁকি দিলেন ভেতরে। কিছু দেখতে পেলেন না। চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো তার, সমস্ত উদ্বেগ নিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন সম্পূর্ণ। না, কেউ নেই, ফাঁকা।

দরজা বন্ধ করে রুমের চারপাশটায় একবার চোখ বুলালেন ফেরদৌসী বেগম। চোখে প্রশ্ন — গেল কোথায় লোকটা!

খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল হাসপাতালে। সেই ডাক্তারসহ আরো কয়েকজন ডাক্তার দৌড়ে এলেন রুমে। সবাই মিলে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেনও এদিক-সেদিক। না, মাখরাজ মুৎসুদ্দী নেই, কোথাও নেই!

ফেরদৌসী বেগমের চোখে জল টলটল করছে। হঠাৎ তিনি যখন চিৎকার করে কাঁদা শুরু করলেন, ঠিক তখনই বেশ নির্ভার ভঙ্গিতে রুমে ঢুকলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। সবাই উৎসুক হয়ে ফিরে তাকালেন তার দিকে। দিনা দ্রুত দৌড়ে এসে তার হাত ধরে বলল, 'বাবা, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? সবাই খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

কিছুটা হাঁপাচ্ছেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বেডে বসে তিনি উদাসভাবে সবার দিকে তাকালেন। হাসপাতালের সবাই বিব্রত, অনাগ্রহও। চলে গেলেন সবাই যার যার কাজে।

রেগে আছেন ফেরদৌসী বেগম। দিনা বাবার পাশে গিয়ে বসল, 'বললেন না কোথায় গিয়েছিলেন?'

'বাসায়।' ছোট্ট করে উত্তর দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

'কেন!' কিছুটা শব্দ করে বলল দিনা।

'তোরা সব এখানে। আমার মনে হচ্ছিল বাসার সবগুলো লাইট জ্বালানো। গিয়ে দেখি, সত্যি সব লাইট জ্বালানো। নিভিয়ে আসলাম সেগুলো। এমনিতেই এতক্ষণ অনেক টাকা বিল উঠেছে। আচ্ছা — ।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী ফায়াজের দিকে তাকান, 'আমি যে বাসায় কারেন্টে শক খেলাম, তখন কি বিল উঠবে?'

বাসায় এসেই মাখরাজ মুৎসুদ্দী বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে বললেন, 'অযথা এতগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। হাসপাতালে না গেলে কী হতো!'

ফেরদৌসী বেগম রেগে ছিলেন এতক্ষণ। একটা কথাও বলেননি রাস্তায়। মাখরাজ মুৎসুদ্দীর কথা শুনে একেবারে জ্বলে উঠলেন তেলে-বেগুনে, 'কয়েক মাস ধরেই আপনার মাঝে এক ধরনের কঞ্জুসপনা দেখছি। এত দিন কিছু বলি নাই। আপনার অনেক বেশি টাকা নাই, কিন্তু অভাব আছে কোনো আপনার? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। টাকা জমিয়ে আপনি কী করবেন? কবরে নিয়ে যাবেন?'

কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, কিন্তু তার আগেই কলিংবেলটা বেজে উঠল বাসার। সুমী দৌড়ে গিয়ে

দরজা খুলে দিতেই খায়ের পাটোয়ারীর গলা শোনা গেল, 'ভাইজান, আছেন নাকি বাসায়?'

বুকের ভেতরটা লাফাতে শুরু করল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। কপালের কাটা জায়গাটাতেও টনটন করে উঠল হঠাৎ। বেডরুম থেকে বের হয়ে ড্রইংরুমে আসতেই খায়ের পাটোয়ারী জড়িয়ে ধরলেন তাকে। বুকের সঙ্গে ঠেসে ধরতে ধরতে বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে এসেছিলাম। শুনলাম কারেন্টে শক খেয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছে আপনাকে। কপাল তো সম্ভবত অনেকখানি কেটে গেছে।'

'জি।' ছোট্ট করে জবাব দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তারপর কোনার সোফাটায় গিয়ে বসলেন।

খায়ের পাটোয়ারীও সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'যাক, অল্পের মধ্য দিয়ে গেছে। আল্লাহর রহমতে বড় কোনো বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন আপনি।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দী এবারও ছোট্ট করে বললেন, 'জি।'

মাখরাজ মুৎসুদ্দীর গলার স্বরটা কেমন যেন ঠেকল খায়ের পাটোয়ারীর। তিনি একপলক তার চেহারাটা দেখে একটু সোজা হয়ে বসলেন, 'আসলে আমি এসেছিলাম আপনাকে দাওয়াত দিতে। বাড়িটাতে ছয়তলা ফাউন্ডেশন দিয়েছি, তিনতলা পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারলাম। অনেক দিন তো ভাড়া বাসায় থাকলাম, কাল নিজের বাসায় উঠতে চাচ্ছি। সেই উপলক্ষে একটু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেছি রাতে। বাসার নিচেরতলাতেই আয়োজনটা হবে।' মাখরাজ মুৎসুদ্দীর ডান হাতটা নিজের দু'হাতের মাঝে চেপে ধরলেন খায়ের পাটোয়ারী, 'আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে ভাইজান। আপনি আমার নিকট প্রতিবেশী, আপনি না আসলে কী চলবে!' হাতটা আরো একটু চেপে ধরলেন তিনি, 'কথা দেন, আসবেন।'

ফোঁৎ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মাখরাজ মুৎসুদ্দী বললেন, 'আসব।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। আপনি আসবেন শুনে খুবই খুশি লাগছে আমার।' সোফা থেকে ওঠার ভঙ্গি করলেন খায়ের পাটোয়ারী, 'আমি তাহলে এখন আসি। কিছু কাজ বাকি আছে, রাতেই সারতে হবে সেগুলো। কাল তো আর সময় পাব না।'

'রাত করে বাসায় এসেছেন। কী খাবেন—ঠাণ্ডা, না গরম?' খায়ের পাটোয়ারীর মুখের দিকে তাকালেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী।

হাত কচলাতে কচলাতে খায়ের পাটোয়ারী বললেন, 'কোনো কিছুর দরকার ছিল না। কিন্তু আপনি যখন বলছেন!' একটু থামলেন তিনি, 'ঠাণ্ডা হলেই ভালো।'

'রুহ আফজা, না কোক?'

'রুহ আফজা বানাতে আবার ঝামেলা। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করো, গ্লাসে ঢালো, রুহ আফজা আর চিনি মেশাও। চামচ দিয়ে নাড়েরা। নানান ঝামেলা। কোকই দেন।'

'বোতলে খাবেন না গ্লাসে?'

'গ্লাসই তো ভালো।'

'সাদা গ্লাস, না ডিজাইনওয়ালা গ্লাস?'

'ডিজাইনওয়ালাতে দেন।'

'জ্যামেতিক ডিজাইনওয়ালা, না ফুলের ডিজাইনওয়ালা?'

'ফুলের ডিজাইনওয়ালা।'

'দুঃখিত ভাইজান, আমার বাসায় তো ফুলের ডিজাইনের কোনো গ্লাস নাই।' মাখরাজ মুৎসুদ্দী উঠে দাঁড়ান সোফা থেকে। এগিয়ে যান দরজার দিকে। তাই দেখে এগিয়ে যান খায়ের পাটোয়ারীও। হাত মিলিয়ে বের হয়ে আসেন তারপর বাসা থেকে।

সারা রাত এক ফোঁটা ঘুমাতে পারেননি মাখরাজ মুৎসুদ্দী। কপালের কাটা জায়গাটা যতটুকু না ব্যথা করেছে, তার চেয়ে বেশি ব্যথা করেছে বুকের ভেতর। খায়ের পাটোয়ারী বাড়ি করে সেই বাড়িতে বসবাস শুরু করবে, আর তিনি কিনা টাকারই জোগাড় করতে পারলেন না। হিসাব করে দেখেছেন—গ্রামের জমি বিক্রির টাকা আর জমানো টাকা দিয়ে ভালোভাবে দোতলা পর্যন্ত করতে পারবেন, কিন্তু খায়ের পাটোয়ারী তো তিনতলা পর্যন্ত শেষ করেছে। কষ্টেসৃষ্টে তিনিও তিনতলা পর্যন্ত করতে পারবেন, কিন্তু হাত একেবারে খালি হয়ে যাবে তার। সংসার, দুই ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া, ডাক্তার, আরো কত খরচ আছে না!

সারা দিনও ভালো যায়নি তার। সারাক্ষণ খায়ের পাটোয়ারীর দাওয়াতের কথা মনে হয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়ি শেষ করেছে, আর সেই বাড়িতে তিনি কিনা দাওয়াত খেতে যাবেন! না গেলেও একেকজন একেক কথা ভাববে। মনে করবে, হিংসায় দাওয়াত খেতে যাননি।

মন খারাপ করে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ফেরদৌসী বেগম আলমারি থেকে ভালো পাঞ্জাবি আর পাজামাটা বের করে দিয়েছেন। চামড়ার ভালো একটা পাম শু আছে, যত্ন করে পরিষ্কার করে দিয়েছেন সেটাও। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একটু পর খায়ের পাটোয়ারীর বাড়ি যেতে হবে। এলাকার অনেকেই আসবে। গল্প হবে, আড্ডা হবে, ঘুরে ঘুরে সবাই তার বাড়ি দেখবে, তারপর খেয়েদেয়ে চলে আসবে যার যার বাসায়।

সাদা একটা রুমাল মাখরাজ মুৎসুদ্দীর দিকে এগিয়ে দিয়ে ফেরদৌসী বেগম বললেন, 'চেহারাটা এমন অন্ধকার করে রেখেছেন কেন? সারা রাত ঘুমাননি, খালি ছটফট করেছেন। সারা দিনও তেমন কথা বলেননি, গম্ভীর হয়ে থেকেছেন। আপনার কী হয়েছে, বলেন তো?'

রুমালটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, 'কিছু না।' তারপর বের হয়ে এলেন বাসা থেকে।

বাসার বাইরে এসে সামনের দিকে তাকালেন তিনি। এখান থেকে খায়ের পাটোয়ারীর বাসাটা স্পষ্ট দেখা যায়। বেশ কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওই বাসার সামনে, গল্প করছে, হাসাহাসি করছে। এখান থেকেই শব্দ পাওয়া যাচ্ছে তার।

নিজের বাসার সামনে থেকে আস্তে আস্তে ওই বাসার দিকে এগিয়ে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বুকের ভেতরটায় কী যেন চেপে আছে। ভারী হয়ে আছে সারা শরীর। বাসার সামনে আসতেই হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল। একটু পর কাঁদতে শুরু করল অনেকগুলো মানুষ। খায়ের পাটোয়ারীর তিনতলা থেকে আসছে শব্দগুলো। নিচের কেউ বুঝতে পারছে না আসলে কী জন্য কাঁদছে সবাই। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে এসে একজন বলল, 'খায়ের পাটোয়ারী সাহেব মারা গেছেন। কাপড়-চোপড় পরে সবার সঙ্গে দেখা করার জন্য নিচে নামতে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ বাঁ বুকটা চেপে ধরেন। একটু পর শুয়ে পড়েন মেঝেতেই। তারপর সব শেষ।'

শরীরটা প্রচণ্ড কেঁপে ওঠে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর। মাথাটাও কেমন যেন ঘুরে ওঠে। স্থির থাকতে পারছেন না। একটু পর তিনি খেয়াল করেন, টপটপ করে পানি পড়ছে তার চোখ দিয়ে।

দ্রুত বাসায় ফিরে আসেন তিনি। তার ব্যক্তিগত আলমারিটা খুলে জমানো টাকা হিসাবের খাতাটা বের করেন। দু'হাত দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন টুকরো টুকরো করে।

খোলা আলমারিটার দিকে একপলক তাকান। অনেকগুলো টাকা বের হয়ে আছে কাপড়ের ভাঁজ থেকে। সবগুলো টাকা বের করে ছড়িয়ে ফেলেন সারা ঘরে। ফেরদৌসী বেগম, দিনা, ফায়াজ, সুমী সবাই দৌড়ে এসেছে ঘরে। দুই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে তারা। কেউ কিছু বলছে না। কেবল ফেরদৌসী বেগম কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বাঁ হাত লম্বা করে থামিয়ে দিলেন তিনি তাকে কঠোর ভঙ্গিমায়।

দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ-চোখ ঢেকে বিছানায় বসেই শব্দ করে কেঁদে উঠলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। তারপর শব্দ করে বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ করো। এ ক্ষুদ্র সময়ের জীবনের সব ক্ষুদ্রতা থেকে আমাকে রক্ষা করো। ছোট্ট এ জীবনটায় সব লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা থেকে দূরে রাখো আমাকে। অল্প সুখ অল্প দুঃখে জীবনটা পার করতে দাও, প্রভু। কী হবে একটা বাড়ি না করতে পারলে!' মাখরাজ মুৎসুদ্দী কাঁদছেনই।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মাখরাজ মুৎসুদ্দীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ফেরদৌসী বেগম। পিঠে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন চুপচাপ।

বাজারের একটা ব্যাগ নিয়ে পরের দিন বাজারে গেলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী। বেলালকে দেখে বললেন, 'এক কেজি আলু, এক কেজি বেগুন, এক কেজি ডাউল— ।' হাতের লিস্টটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে যা যা লেখা আছে সব এক কেজি করে দাও।'

ভুল সংশোধন করে দেওয়ার ভঙ্গিতে বেলাল বলল, 'প্রতিটাতে এক শ' গ্রাম করে কম দেব, না!'

প্রাণখুলে একটা হাসি দিলেন মাখরাজ মুৎসুদ্দী, 'না, পুরো এক কেজি করেই দিও।'